

অভাগী

(তৃতীয় খণ্ড)

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
• ২০৩১১ কৰ্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আট আনা

সংস্করণ
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় গুণ্ডা
২০৭/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

অধিন-১৩১৯

প্রিন্টার
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় গুণ্ডা
২০৭/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা



দু'টি কথা

অনেক দিন আগে সৌন্দর্যপ্রতিম শ্রীমান্ শান্তি দত্তের অগ্রহে 'অভাগী' লিখতে আরম্ভ করি। আমি ব'লে যেতাম শ্রীমান্ শান্তি লিখে নিত। শেষে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভায়ার অত্যধিক তাগাদায় তাড়াতাড়ি নিজেই লেখা শেষ করি এবং হরিদাসবাবু এখানিকে তাঁর আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশ করে, 'অভাগী'র গৌরব বৃদ্ধি করেন। তার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় খণ্ড নিজের ইচ্ছাতেই লিখি। তৃতীয় বা শেষ খণ্ড লিখবার উৎসাহ আমার একেবারেই ছিল না। বিগত বৎসর (১৩৩৮) পূজার সময় আমি স্বাস্থ্যলাভের জন্য সুন্দর রেওয়া রাজ্যে আমার বৈবাহিক, সেখানকার স্টেট ইন্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত শ্রীপতি ঘোষ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করি। সেই সময় তাঁহার বিদূষী কুমারী কল্পা শান্তি আমাকে 'অভাগী'র শেষ খণ্ড লিখবার জন্য উত্তেজিত করেন এবং প্রথম খণ্ড লিখবার সময় শ্রীমান্ শান্তি যেমন স্বেচ্ছায় লিপিকরের কার্য করেন, এবারেও আর এক 'শান্তি'—আমার দুহিতাসমা কুমারী শান্তি খাতা বেধে, আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। তারপর, আমি যখন রেওয়া থেকে চ'লে আসি, তখন শান্তির

কাছে আমাকে প্রতিশ্রুত হ'তে হয় যে, বইখানি আমি শেষ করব ।
 এক বৎসর পরে আমি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি ;
 এবং এই শেষ খণ্ড কুমারী শান্তির নামে উৎসর্গ করে বিমল
 আনন্দলাভ করলাম । ইতি

কলিকাতা
 আশ্বিন, ১৩৩৯

}

শ্রীজলধর সেন

কুমারী শান্তি ঘোষের

কল্পকলমে—

অভাগী

তৃতীয় খণ্ড

এক

[সুশীলার কথা]

হরিধারের এই স্বামীজির আশ্রমে আমার তো প্রায় ছ'টা বছর কেটে গেল।

এতদিন স্বামীজি যা আদেশ করেছেন, নির্দিষ্টকরে তা পালন করেছি। করেছি কি—এখনও করছি। কিন্তু এই যে ছ' বছর গেল, এর মধ্যে লাভ-লোকসানের একটা হিসাব করা দরকার হয়েছে।

কেহ হয়তো বলবেন, ওর আর হিসাব-নিকাশ কি? অচলানন্দ স্বামী যে পথ দেখিয়ে দেবেন তাই তোমার পক্ষে শ্রেয়। তুমি অবিচলিতচিত্তে সেই পথে ঠাৱ নির্দেশ অল্পসারে কাজ ক'রে যাবে। কলের আকাজকা তো তোমার করতে হবে না, সে সব গুরুদেবকে সমর্পণ ক'রে তুমি নিষ্কামভাবে কাজ

ক'রে যাবে। এই তো তোমার কর্তব্য। তবে আর লাভ-লোকসান দেনা-পাওনার কথা তোলো কেন ?

এতদিন এই দুই বৎসর তাই তো ক'রে এসেছি। কোনো দিন একটা কথা—একটা প্রশ্ন—একটা দ্বিধা আমার মনে হ'য়নি। আজই যে হয়েছে তাও ঠিক বলতে পারি না।

কিন্তু এই কয়েকদিন থেকে আমার নিজের কথা সর্বদাই মনে উঠছে। সেই কথাগুলোই একটু গুছিয়ে বলছি।

এই আশ্রমে যখন এসে পৌঁছুলুম, স্বামী আত্মানন্দ যখন আমাকে সাজাহানপুরে সেই নরপশুর হাত থেকে অভাবিতরূপে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে এই ভূস্বর্গ হরিদ্বারের গুপ্তাতীরে স্বামীজির পাদমূলে আমাকে সমর্পণ করে দিলেন, তখন আমি মনে করেছিলুম আমি পথ পেয়েছি। বাবা 'বিশ্বনাথ আমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। তখন আমি নিঃসঙ্কোচে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলুম। তারি চার পঁচদিন পরে হবে বোধ হয়, বড়-মাসীমা ও তিনকড়ি মামা এই আশ্রমে এলেন। তাঁরা আমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তখন বলেছিলুম—আমি আর লোকালয়ে যাব না। এই আশ্রমেই জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটিয়ে দেব। স্বামীজি কিন্তু তখন বলেছিলেন—তোমাকে এখান থেকে যেতেই হ'বে, কিন্তু এখন নয়।

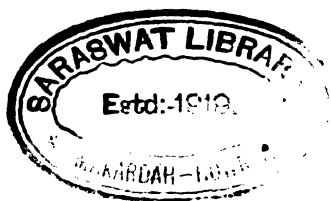
তার ৭৮ মাস পরে হরেনবাবু, খুড়ীমা ও রাগীকে নিয়ে এই আশ্রমে এলেন। রাগীর কোলে ছেলে। সে ছেলে দেখে

আমার প্রাণ অধীর হ'য়ে গেল। তাকে নিয়ে যে কিঁ করব ভেবে পেলাম না। পুরো একটা সপ্তাহ সেই মায়ার বন্ধনে কেটে গেল। স্বামীজির নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম আমি সেই সাতদিন অবহেলা করলাম। স্বামীজি কিন্তু একটা কথাও বলেন না; বরঞ্চ রাগীর সেই ছেলে ভবশঙ্করকে আদরে-চুম্বনে একেবারে অধীর ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু সাতদিনের পরে কে যেন আমার প্রাণের ভিতর থেকে ব'লে উঠল, ও কি কচ্ছ। এ তোমার পথ নয়। অমনই আমার হৃদয় কঠোর হ'য়ে উঠল। অমন মোহের বন্ধন অম্লানবদনে ছিন্ন ক'রে তাদের বিদায় দিলাম। একবারও মনে হ'ল না তাদের কাঁছে, স্বর্গীয় সতীশকাকার কাঁছে, আমার কি অপরিশোধনীয় ঋণ।

তারপর শুনবে? রাগীরা চলে যাবার মাস ৩৪ পরে হঠাৎ একদিন তিনকড়িমামা এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি বলেন বড়-মাসীমা কঠিন রোগে শয্যাগত; ডাক্তারেরা বলেছেন তাঁর আর বাঁচবার আশা নেই। তাঁর বড়ই ইচ্ছা জীবনের শেষ মুহূর্তে একবার আমাকে দেখেন। এই সংবাদ শুনে আমি ঋণেকের অস্ত্র জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়লুম। বড়-মাসীমা মৃত্যুশয্যায় আমাকে দেখতে চেয়েছেন—ধেতেই হবে; কিন্তু পরক্ষণেই কে অলক্ষিতে থেকে আমার প্রাণের মধ্যে দৈববাণী করল, না—না, ও-পথ তোর নয়। আমি কঠিন পাষণে-বুক বেঁধে বল্লুম—ফিরে যাও তিনকড়িমামা, আমি যাব না। ও-পথ আমার নয়। মাসী-মা মরবেন না; নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবেন। এ আমি

তোমার বলে দিচ্ছি। সেই কথা মনে হ'য়েই। ঐতদিন পরে আমার মনের মধ্যে যে কথা উঠেছে, তা আমি চেপে রাখতে পাচ্ছি না—যে, ও-পথ আমার নয়—এ-পথ আমার নয়—সে-পথ আমার নয়, তবে কোন্ পথ আমার? তোমরা হয় তো দৃঢ়তার সঙ্গে বলবে—সে ভাবনা তোমার কেন? গুরু যে পথ নির্দেশ করুবেন সেই পথে চলো।

এইখানেই খটকা লেগেছে বন্ধু! এমন করে চলবার বিরুদ্ধে আমার নারীশক্তি আজ মাথা নাড়ছেন। সূত্রাং স্ত্রীর হোক, অস্ত্রীর হোক, এই দু'বৎসরের কৃতকার্যের একটা হিসাব-নিকাশ না করে থাকতে পাচ্ছি না।



হই

এই আশ্রমে এসে প্রায় দু'বৎসর আমি কি করেছি এবং এখনও কি কচ্ছি, তারই একটা হিসাব দিই। প্রথম বেদিন আত্মানন্দস্বামীর সঙ্গে এখানে এলাম, সেইদিনই কি জানি কেন, আগে থেকেই আমার মস্ত একটা কুটীর নির্দিষ্ট হ'য়েছিল। আশ্রমের অন্ত সকল বাসগৃহ, স্বামীজির আসন, এ সব আশ্রম কুটীর থেকে দূরে ছিল। কোনো রকম কোলাহল আমার শাস্তির বিষয় না করতে পারে স্বামীজি সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। পথে আসবার সময় লোকের সন্দেহ-দৃষ্টি এড়াবার জন্য আত্মানন্দ-স্বামী আমাকে একখানা গৈরিকবস্ত্র পরতে দিয়েছিলেন। তাই প'রেই আমি প্রথম স্বামীজির সম্মুখে উপস্থিত হই। আমার পরণে সেই গেকরা রং-করা কাপড় দেখেই স্বামীজি বলেছিলেন, ভিতরে রং না ধরলে বাইরে ও-রঙ চলে না। কথাটা আমিও বুঝেছিলুম। এই যে গৈরিক বসন, ইহা এক দিন পৃথিবী একেবারে মুছ ক'রে ফেলেছিল; এই গৈরিকবসনই আমেরিকার ধর্মমণ্ডলে স্বামী বিবেকানন্দজিকে জগজ্জয়ী ক'রেছিল। এই গৈরিকের রংয়েই তাঁর হৃদয় রঞ্জিত হ'য়েছিল; তাই তিনি তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান বক্তৃতায় অতৃতপূর্বক বাগ্‌বিত্তি দেখিয়ে সমস্ত সভ্য-জগৎকে বিমুগ্ধ ও তন্ত্রিত করে দিয়েছিলেন। আমাদের দেশ যে এত গরীব হয়েছে, তবুও

এই গৈরিক-পরা কেউ গিয়ে কোন অতি দরিদ্রের দুয়ারের সম্মুখে “নমো নারায়ণ” বলে দাঁড়ালে সেই দরিদ্র ব্যক্তিও তাকে বিমুগ্ধ করতে পারে না। তার সেই বহুকষ্ট সংগৃহীত সামান্য অল্পের অংশ সহাস্ত্রমুখে সাধুর হাতে তুলে দেয়। আবার এই গৈরিকের আবরণে আচ্ছাদিত হ’য়ে কত জন কত রকমে কঁত বীভৎস কার্যের অনুষ্ঠান করে থাকে, গৈরিক বস্ত্র ভেদ করে তা বাইরে আত্মপ্রকাশ কর্তে পারে না। তার প্রমাণ আমি আমার জীবনেও পেয়েছি। যাক গিয়ে সে কথা। আমি কিন্তু অধিকারী না হ’য়েও সেই আত্মানন্দস্বামীর দেওয়া গৈরিক বসন পরেছিলুম, আজও তা ছাড়ি নি। অক্লভাবে সেই বসনের ছদ্মবেশেই এতদিন কাটিয়েছি, স্বামীজিও কোনদিন কোন আপত্তি করেন নি।

কিন্তু এই আবরণ—এই ছদ্মবেশ এখন আমাকে পীড়া দিতে আরম্ভ ক’রেছে। সাধু সন্ন্যাসীর পবিত্র তপোবনে আছি, তাঁদের সেবা করছি, তাই তাঁদেরই মতন বসন পরিধান ক’রে এতদিন কাটিয়েছি। এখন কিন্তু ও-নিয়ে মনে খটকা বেধেছে— কেন তা জানি না।

এই আশ্রমে এতদিন কি ভাবে কাটিয়েছি, তাই আগে বলি। স্বামীজির আদেশমত সূর্য-উদয়ের পূর্বেই গঙ্গাঙ্গানে গিয়েছি। আমার কুটারে বিছানাপত্র বা আসন দূরে থাকুক, ছোট একটা জলের পাত্রও প্রবেশাধিকার পায় নি। গ্রীষ্মকালে মাটিতে শুয়েই কাটিয়েছি; শীতকালে হরিদ্বারের প্রবল শীতেও একপানি

কমলের বেণী আমার প্রয়োজন হয় নি। কি নীত ক্রি গ্রীষ্ম, সূর্য্যের অল্পদয়কালে গন্ধান্নান করেছি, তাতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি, একটুও অসুবিধা বোধ হয়নি। গন্ধান্নান করে উঠে সেই ভিজে কাপড়েই স্বামীজি যে ছোট একটা প্লোক আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন, পূর্বদিকে মুখ করে আমি সেই ছোট প্লোক আবৃত্তি করেছি—

“জ্বাকুমুম সংকাশং কাশ্রুপেয়ং মহাদ্ভাতিম্।

ধ্বস্তারিং সর্কপাপয়ং প্রণতোহস্মি দিবা করম্ ॥”

এই বলে তখনও অমুদিন দিবা করকে প্রণাম করেছি,—সে প্রণাম তিনি নিয়েছেন কি না, এখনও নেন কি না, এ কিন্তু আমি আজও বুঝতে পারলুম না। কিন্তু উবার অরুণ-রাগাগমের পূর্বে স্নানান্তে অদূরে অত্রভেদী হিমালয়ের যে মহিমময় মূর্তি আমি দেখেছি, তার সস্তুখে প্রণতা না হ’য়ে আমি পারি নি। সে প্রণাম তিনি গ্রহণ করেছেন—নিশ্চয়ই করেছেন, এ আমি জানি, এ আমি প্রাণে অনুভব করেছি। নইলে তাঁরই প্রেরিত মলয় পবন আমার প্রাণে শাস্তি বর্ষিত করত না; নইলে তাঁর হৃদয় নিঃসৃত অমৃতধারা পতিতপাবনী গঙ্গা কুলুকুলু করে কত অমৃতময়ী বাণী শুনিতে দিত না। এ সব কথা বলতে গেলে আমি কেমন আত্মহারা হ’য়ে যাই, তাই আমার এই প্রণগততার জন্ত ক্ষমা চাই বন্ধু! তোমাদের কাছে ক্ষমা চাই!

স্নানান্তে আশ্রমে ফিরে এসে আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগের আর

সময় পেতাম না। সাধু-সন্ন্যাসীরা ও আশ্রমের সকলে জেগে উঠতেন; আমার দিনের কার্য আরম্ভ হ'ত। তাঁদের তত্ত্বাবধান, তাঁদের সেবার ব্যবস্থা কি জানি কেমন করে আমার উপরে এসে পড়েছিল। স্বামীজি দিয়েছিলেন, না আমি নিজেই নিয়েছিলাম, তা ঠিক বলতে পারি না। আশ্রমবাসীদের যার যা দরকার সে সব আমি আমার দৃষ্টির সন্মুখে নিয়েছিলুম। গৃহস্থের সংসার ছেড়ে দিয়ে সৰ্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, পবিত্রচেতা শিক্ষার্থী এদেরই বৃহৎ সংসার আমি মাথায় করে নিয়েছিলুম। স্বামীজি দেখতেন, আর একটু হেসে বলতেন, এই যে মা জগজ্জননী! তোর কি শ্রান্তি—ক্লান্তি নেই মা! আমি তাঁর সে কথার উত্তর দিতে পারতুম না। সারাদিন আশ্রমের অধিবাসীদের সেবা অক্লান্তভাবে ক'রে যেতুম। পশুপক্ষী—বৃক্ষলতা পর্যন্ত আমার সেবার বঞ্চিত হয় নি। সারাক্ষে আমার কুটীর-সন্মুখের পাছের তলার আশ্রমের ভাগুর থেকে যে সামান্ত ফলমূল রেখে যেত তারই কিছু আমি গ্রহণ করতুম। অবশিষ্ট অংশ সেখানেই পড়ে থাকত; আমার কুটীরের মধ্যে তারা যেতে পারত না। আমার সারাদিনের কাজই ছিল এই। তারপর সন্ধ্যা লাগত; আশ্রমবাসীরা পূজা-মণ্ডপের সন্মুখে দাঁড়িয়ে সামগান করতেন; আমি ধূপ-দীপ জালিয়ে দিয়ে তাঁদের সকলের পিছনে এসে তাঁদেরই দেখাদেখি হাতবোড় ক'রে দাঁড়াইতুম। তাঁরা যে বেদমন্ত্র গান করতেন, আমি তাতে একদিনও যোগ দিতে পারি নি। আমার মনে হ'ত, এঁদের এই সকল দৈনন্দিন অমুষ্ঠানের

ভিতর প্রাণ নেই, আনন্দ নেই; এ যেন একটা কর্তব্যের
 অহুষ্ঠান। তার পর তাঁরা তাঁদের কুটীরে চলে যেতেন, আমি
 স্বামীজিকে প্রণাম ক'রে নিজের অন্ধকার নির্জন কুটীরে
 যেতুম। তারপর সারারাত্রি শুধু অন্ধকার—শুধু অন্ধকার—শুধু
 অন্ধকার!





তিন

সেই ছই বৎসর আগে, তিনকড়ি মামারা যেদিন চলে গেলেন, সেইদিনই হ'বে কি তার পরদিনই হ'বে সন্ধ্যার পূর্বে স্বামীজি আমায় ডেকে বলেন, মা সুশীলা, তোমার অবসর-সময়ের জন্ত তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়। আমি বললাম—বলুন। তিনি বলেন, বিকেলে তোমার অবসর-সময়ে, রাত্রির অন্ততঃ দ্বিতীয় যাম পর্য্যন্ত তৌসার মনকে অধ্যয়নে নিরত রাখা উচিত। জ্ঞানাত্মশীলন বাতীত মানব-মনের বিকাশ ও পরিণতি লাভ হয় না। আমি বল্লুম—স্বামীজি, অধ্যয়ন এত বেগী করেছি যে তার জালা এখনও ভুলতে পারি নি। স্বামীজি হেসে বলেন, অধ্যয়নের জালা? এ যে নূতন কথা মা! জ্ঞানাত্মশীলনেই তো মনের সস্তাপ দূর হয়। আমি বল্লুম, তা হ'লে শুছুন স্বামীজি, আমার অধ্যয়নের কথা। কলিকাতায় আমার জন্ম। বাবা যথেষ্ট উপার্জন করতেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। স্মৃতরাং আমার বয়স যখন সাত বৎসর তখন ছোটখাটো মেয়ে-স্কুলে আমায় না দিয়ে বাবা আমায় বেথুনে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানে পাঁচ বৎসর পড়েছিলাম। এই পাঁচ বৎসরে অনেক কষ্টে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছিলাম। বয়স তখন এই ১১।১০ হ'বে। বাড়ীতে পড়াবার জন্ত একটু ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি একাধারে মাষ্টার ও পণ্ডিত। তিনি সন্ধ্যাবেলা পড়াতে এসে ব'লে যেতেন, আজ রাত্রে 'গৌ' শব্দের রূপটা মুখত

করে রাখতেই হ'বে। আমি তখন 'গৌ' শব্দের রূপই মুখস্থ করব, না আমার পড়বার বইয়ের ডেস্কের মধ্যে লুকান 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ই পড়ব? রোহিণী পুঙ্করিণীতে জল আনতে যাচ্ছে, এই পর্য্যন্ত পড়বার পর মাষ্টার মশায়কে আসতে দেখে বইখানি লুকিয়ে-ছিলাম, এখন 'গৌ' শব্দের রূপ আগে, না রোহিণী কি করল তাই আগে? অর্থাৎ—বিবাহ দিবার জন্ত বাবা যখন আমাকে বেথুন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন, তখন দুর্গেশনন্দিনী, বিষুবন্ধ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি অনেক পুস্তক পড়া আমার শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। এমন কি, এখন আর বলতে লজ্জা কি, ঐ ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই হরিদাসের গুপ্তকথা পর্য্যন্ত গুলে খেয়ে ফেলেছিলুম। অধ্যয়ন কি কম করেছি স্বামীজি?

তারপর বিবাহ হ'ল। পাঁচ ছয় মাস যেতে-না-যেতেই না কি বিধবাও হ'লুম। সে কাহিনী এখন থাক। অধ্যয়নের কথাই বলি। বিধবা হ'বার পর, আপনি যেমন আজ বলছেন, তেমনই বাবাও বলেছিলেন মা সুলীলা, ভাগ্যে যা ছিল তা হয়ে গেল। এখন তুমি পড়াশুনা নিয়েই দিন কাটাবে। আপনার মত জ্ঞানানুশীলনের কথাটা তিনি বলেন নাই। তাঁর লাইব্রেরীতে অনেক বই ছিল। আমি গোত্রাসে সেইগুলি চর্কণ ও গলাধঃ-করণ করতে লাগলাম। শুন্দলে আশ্চর্য্য বোধ করবেন স্বামীজি, আমার জ্ঞানানুশীলনের জন্ত অধ্যয়ন তখন লগুন রহস্ত এবং ঐ রকম বই। তারই মধ্যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিশানা খুঁজে বেড়িয়ে-ছিলুম। তারপর, বাবার অবস্থা-বিপর্য্যয় হ'ল; আমি আর মা

কম্বুলিয়াটোলায় আশ্রয় পেলাম। সেখানে যে কয় মাস ছিলাম, সেই কয় মাস মাসীমাকে শোনাবার জন্তে একটু-আধটু রামায়ণ-মহাভারত পড়া ছাড়া তিনকড়ি-মামাদের কনসার্টপার্টীর কল্যাণে থিয়েটারের নাটক ও বটতলার বই কি কম অধ্যয়ন করেছি স্বামীজি? এই এত পড়ায় আমার এমন বদহাজম হ'য়েছিল যে, কালীতে এক বামুনবাড়ী রাঁধুনিগিরি করবার সময় এবং সাজাহান-পুরে যে কিছুদিন ছিলাম, এই সময়ের মধ্যে আমি কোন বই স্পর্শও করি নি। এতদিনে যা অধ্যয়ন করেছি, তারই জ্বালা এখনও যে সামলাতে পারছি নি স্বামীজি; স্মরণ ও অধ্যয়ন আমাব' দ্বারা হ'বে না।

স্বামীজি হেসে বললেন, সে কি অধ্যয়ন হয়েছে যা? সেই যে বিষ সংগ্রহ ক'রে এনেছ, এখন জ্ঞানানুশীলন ক'রে, ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সেই হলাহল দেহের অস্থি, মজ্জা, শিরা, ধমনী থেকে দূর করে ফেলতে হবে। শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারাই তোমার হৃদয়ে অমৃত সঞ্চয় করতে হ'বে।

তার কথার উত্তরে আমি স্পষ্ট বলেছিলাম,—সে বিষ আর অমৃতে পরিণত হ'বে না স্বামীজি! আপনার বৃথা চেষ্টা। আমি শাস্ত্রগ্রহ অধ্যয়ন করতে পারব না। তার চাইতেও বড় গ্রন্থ আপনি আমার সম্মুখে খুলে দিয়েছেন; দেখি সেই গ্রন্থ পাঠ করে আমি শান্তি লাভ করতে পারি কি না।

আমার সেইদিনের সেই কথা শুনে স্বামীজি কণকাল নিস্তরক



থেকে হো হো ক'রে হেসে উঠে বলেছিলেন—যা বেটী, তোর আর শাস্ত্রাহুশীগন করতে হ'বে না। তুই তোর সম্মুখে আনন্দময়ীর ব্রহ্মাণ্ড বেদ পেয়েছিস, তোর আর অল্প শিকার দরকার নেই।

আজ তাই এতদিন পরে মনে হচ্ছে এমন পণ্ডিত—এমন বিচক্ষণ স্বামীজিরও ভুল হয়ে গেল! আমি ব্রহ্মাণ্ড-বেদও পাই নি, কুমাণ্ড-বেদও পাই নি। আমি আমার বিগত জীবন-বেদ দিনরাত্রি আলোচনা করে একেবারে পথহারা হ'য়ে পড়েছি। এতদিন যে সব কথা কখনও মনে হয় নি, এখন সেই অতীত স্মৃতিরই রোমন্বন কচ্ছি। এ সমুদ্রমঞ্চে অমৃত তো উঠবে না, প্রাণধাতী গরল উঠবে, এ আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। তাই আমার নিৰ্জ্জন কুটারের অন্ধকারের মধ্যে বসে কত চীৎকার করেছি—আলো—আলো—আরো আলো। কোথায় আলো? অন্ধকারের সমুদ্রে আমাকে ঘিরে ফেলেছে।





চার

এই কয়দিন আগে, কি একটা উপলক্ষে আশ্রমবাসী বিদ্যার্থী-দিগের অনধ্যায় ছিল ; শুধু অনধ্যায় নয়, সারাদিন উপবাসেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বামীজির আদেশ নিয়ে সেদিন খুব ভোরে একদল ব্রহ্মচারী লছমনঝোঙ্গার দিকে চলে গেলেন, কয়েকজন গেলেন পদব্রজে দেৱাতুনের দিকে, কেউ বা বনে-জঙ্গলে সারাদিন কাটাবেন বলে বে'র হয়েছিলেন। গেলেন না শুধু স্বামীজী, সেদিন তিনি ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করবেন স্থির করেছিলেন ; আর গেলেন না আত্মানন্দ, তিনি সে দিনটা একেবারে হাত-পা ছেড়ে অলসভাবে কাটাবেন। তাঁর এই সঙ্কল্পই সবার চাইতে ভাল বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল ; কারণ, তিনি যাই বলুন, অলসভাবে দিন কাটাবার মত ব্রহ্মচারী তিনি ছিলেন না, তা আমি বেশ জানতাম। আমি বুঝতে পারতাম, মধ্যে মধ্যে তিনি এই ভাবে পড়াশুনা বন্ধ রেখে সারাদিন যোগমগ্ন থাকতেন। আশ্রমে যখন কোন কাজ-কর্ম নেই, তখন আমারও অবকাশ ; অনধ্যায়ের ঝালাই ত আমার নেই। উপবাস—সে ত আমার লেগেই আছে।

সেদিন সকালে যথারীতি গঙ্গান্নান শেষ ক'রে এলে আমি আশ্রমের বাগান নিয়ে পড়লাম। এই বিস্তীর্ণ উদ্যান যে আশ্রমের ভাণ্ডার ! এই ভাণ্ডার থেকে ফুল ফুলে এনে পূজার আয়োজন

হয়। এই আশ্রমের তৃণশুল্ক আশ্রমবাসীদের অল্পের উপকরণ সংগ্রহ করে দেয়। এই আশ্রম-সংলগ্ন শাস্ত্রক্ষেত্র অকাতরে আশ্রম-ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে রাখে। এ সকলের তত্ত্বাবধানের ভার কয়েকজন সন্ন্যাসীর উপর দেওয়া আছে। তাঁদের আজ ছুটি। আমি স্বেচ্ছায় পরমানন্দে আজ এই উদ্ভিদ-জগতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মহানন্দে দিনের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত কেটে গেল। তারপর আবার গন্ধার্নান করে যখন আমার কুটীরে ফিরছি, তখন আমার কুটীরের অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে আত্মানন্দস্বামী ভূমিশয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে প'ড়ে আছেন,— যোগমগ্ন, কি ধ্যানমগ্ন, তিনিই জানেন।

আমি যখন তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমার পায়ের শব্দ পেয়ে হো'ক, বা অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গ হ'য়েই হো'ক, উঠে বসলেন এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন, এমন অসময়ে মন ?

আমি বললাম, মনের বা যোগধ্যানের সময় অসময় আছে কি স্বামীজি ?

স্বামীজি বললেন, সারাদিন কোথায় ছিলে ?

আমি বললাম, কৈ, সে ধোঁজ ত কোনদিন করেন নাই ?

আত্মানন্দ বললেন অল্প দিন ত বাধা নিয়মের কাজ, তার আর অহুস্কানের প্রয়োজন হয় না। আজ অবকাশ কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

আমি বললাম, আজ জীব-জগৎ ছেড়ে উদ্ভিদ-জগতে প্রবেশ

করেছিলাম। জীবের সঙ্গ অপেক্ষা উদ্ভিদের সঙ্গ অধিক লোভনীয় ; শুধু লোভনীয় নয়, অধিক প্রার্থনীয়। তা সে সব তত্ত্বকথা থাক। একবার উঠুন না স্বামীজি, আমার কুটীর-প্রাঙ্গণের বৃক্ষতলে আসন ক'রে দিই। সেখানে ব'সে আমাকে গোটাকয়েক তত্ত্বকথা শোনান না প্রভু !

আত্মানন্দ সহাস্ত্রমুখে বললেন, তত্ত্বকথা শোনার স্পর্ধা নিয়ে এস্থান থেকে আত্মানন্দ এক পাও নড়ছেন না। তোমার উদ্ভিদ-জগতের কোন নূতন তথ্য যদি শোনার থাকে তবে দেবী, অগ্রসর হও। তোমার বস্ত্র-পরিবর্তন হ'লেই আমি তোমার বৃক্ষমূলে উপস্থিত হব।

বেশ, তাই আসুন। আমিই না হয় আজ গোটাকয়েক কটু কথা শোনাবো।

আত্মানন্দ সহাস্ত্রে বললেন কটু কথা ! এ যে অযত পরিবেশন ! সে বেশ হবে, পরম উপাদেয় হবে।

আমি কুটীরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। একটু পরেই শুন্তে পেলাম আত্মানন্দ বলছেন, কাল যে অতীত হয়ে যায়।

আমি কুটীরमध्ये আর অপেক্ষা না ক'রে বেরিয়ে এলাম। আত্মানন্দ বললেন, কৈ, তুমি ত ভিজ্জে কাপড় ছাড় নাই ?

আমি বললাম, শুকনো কাপড়, শুধু কাপড় কেন, শুকনো কিছুই আমার ভাল লাগে না স্বামীজি ! আপনাদের আশ্রমে এসে তাই আমি প্রায় সর্বদাই ভিজ্জে কাপড়ে থাকি ; এতে বেশ ত্রিষ্কণ্টা উপভোগ করি। দাড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন ঐ

ভূমিশযায়। আমার কুটারে কোন আসন নেই, তা তু আপনি জানেন।

আত্মানন্দ সেই প্রস্তর-গ্রথিত বৃক্ষবেদীমূলে বসলেন, আমিও তাঁর অদূরে বসে পড়লাম।

‘তারপর? তারপর প্রায় দশ মিনিট ছ’জনেই নীরব। আত্মানন্দ কি ভাবছিলেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবছিলাম, কি বলি? আত্মানন্দের কাছে বলবার অনেক কথা আছে, তাঁর কাছ থেকে জানবার অনেক কথা আছে। কিন্তু কোনটা রেখে কোনটা আগে বলি, এই হ’য়ে পড়ল কঠিন সমস্যা। যদি বা মনে করি, এই কথাটাই আগে তুলি, অমনি মনের মধ্য থেকে আর একজন তাকে ঠেলে ফেলে এগিয়ে আসে।

এইভাবে প্রায় দশ মিনিট চ’লে গেলে আমি এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলাম, আচ্ছা স্বামীজি, আপনাদের এই যে সব সাধন-ভজন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, এ-সব কিসের জন্ত?

এমন প্রশ্ন বৃষ্টি স্বামীজি কখনও শোনেন নাই, আমার কাছ থেকে আশাও করেন নাই। তিনি বিপুল বিশ্বয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এই প্রশ্নটা এমনভাবে যে আমি করব, তা আমার মনেও কখন উদ্ভিত হয় নাই। একটু ভেবে-চিন্তে গুছিয়ে গাছিয়ে, ধীরে ধীরে যদি কথাটা বলতাম, তা হ’লে আত্মানন্দস্বামী এমন বিহ্বল, এমন বিব্রত হ’য়ে পড়তেন না। এমন কথা যে তিনি আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ’তে শুনবেন, এ কথা তিনি

আশাও করতে পারেন নাই। এত কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর, এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর তাঁদের সাহচর্য লাভ ক'রে, পরম পবিত্রচেতা মহাপণ্ডিত স্বামী অচলানন্দের অতুলনীয় নেহের অধিকারিণী হয়ে, এখন কি না প্রসন্ন করছি, আপনাদের এ সাধন-ভজন, এ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কিসের জন্ত ?

তাই উদ্বার হৃদয়, নির্মল-চরিত্র, জ্ঞান-গরিষ্ঠ স্বামী আত্মানন্দ বিমূঢ়ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ; একটা কথাও বলতে পারলেন না ; তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অনন্তসাধারণ প্রতিভা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্ত যেন 'দিশেহারা' ক'রে দিল।

তারপর নিজেকে সংবৃত্ত ক'রে অতি ধীরভাবে তিনি বললেন, মা সুশীলা, বুধাই কি এতদিন শাস্ত্রালোচনা করলাম, বুধাই কি এতদিন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করলাম ! তুমি যে এই ভাবে অহুসন্ধান করছ, তা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি মা ! কিন্তু, এত শীঘ্রই যে তুমি একটা ঠিকানায় পৌঁছবার জন্ত, তোমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হ'বার জন্ত ব্যাকুল হবে, এইটাই আমি ধরতে পারিনি। তাই, বিশ্বয়-বিমূঢ় হ'য়ে তোমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না, ইচ্ছে করেই দেব না। কাশী থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন তোমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে এসেছি ; তোমার চিন্তা, তোমার মন যে কি সব সমস্ত সমাধানের জন্ত অর্হনিশ কাণ্ডত, তোমার মুখে আমি প্রতিদিন তার রিকশ

দেখেছি। অন্ধকার রাত্রিতে এই গাছের তলায় বসে তুমি যে কি ভাবে, কি চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে কাটিয়েছ, তা কি আমার দৃষ্টি স্নতিক্রম করতে পেরেছে ব'লে তুমি মনে কর? কমা করো মা; বেদান্তের, ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার জীবনের এতকাল কাটিয়েছি। জীবনে কোন দিন কোন রমণীর সাহচর্য প্রার্থনা করি নি। অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত কাশীর আশ্রমে তোমার আবির্ভাব হ'ল। আমার অপঠিত এক মহা-শাস্ত্রের পৃষ্ঠা আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'ল। আমি অপার বিশ্বয়ে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করলাম। অগজ্জননীর হৃদয়ের বিচিত্র গীলাভঙ্গী আমাকে এক নূতন জগতে নিয়ে গেল। তারপর কাশীর আশ্রম কেন ত্যাগ করেছিলাম, তা সেই সময়ই তোমাকে বলেছিলাম। তোমাকে আমার সতর্ক দৃষ্টির বাহিরে রাখতে আমার মন যায় নি; কিন্তু কি করব, তোমাকে আরও সংগ্রাম করতে হবে, আরও পোড় খেতে হবে। তাই ভেবেই আমি চ'লে এসেছিলাম। এখানে এসে সব কথা গুরুদেবকে বলেছিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, যথাসময়ে তোমাকে এখানে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। তোমাকে যে এ আশ্রমে ধরে রাখতে পারবো না, তোমার পথ যে আমাদের পথ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সে কথা ত গুরুদেব সকলের সম্মুখেই বলেছিলেন; আমিও যে তা বুঝতে পেরেছিলাম। সেই থেকে তোমার গতিপথ কোন্ দিকে, তা আমি পর্যবেক্ষণ করে আসছিলাম। কিন্তু মা, তোমার এই ক্রুত বেগের সঙ্গে

আমি চলতে পারি নি ; তুমি অনেক এগিয়ে এসেছ। তাই আজ তোমার প্রাণে আমি স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিলাম—এত শীঘ্র, এত শীঘ্র ! হয়েছে তোমার প্রাণের উত্তর-দান। প্রাণ আর ক'র না মা ! উদ্ভাটিত কর তোমার মহিমময়ী হৃদয় ! বল, তুমি কি বলবে।

আত্মানন্দস্বামী বতরুণ কথা বলছিলেন, আমি ততক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম ; তাঁর সকল সুন্দর কথায় যে অপূর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ হচ্ছিল, তাই আমি দেখছিলাম। তিনি যখন নীরব হ'লেন, আমি তখন বললাম, স্বামীজি, কি কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কি কথা ব'লে ফেলেছি। এ-কথা না জিজ্ঞাসা করলেও হ'ত। কিন্তু যখন ব'লে ফেলেছি, তখন খুলেই বলি।

তার আগে কিন্তু আর একটা কথা ব'লে নিতে হচ্ছে। এই যে ব্রহ্মচারী, স্বামী, মহারাজ, আপনি, মশাই—এ সব পোষাকী সম্বোধন আর তোমাকে করতে পারতেন, কেমন যেন দূর দূর থেকে। আজ থেকে,—এই এখন থেকেই ও-সব ভদ্রতা টেনে ফেলে দিয়ে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করি ; ওতে প্রাণের ভিতর থেকে সাড়া আসে ; 'আপনি' 'মশাই' এরা বাহিরে গড়াগড়ি যায়।

আর একটা কথা। তোমাকে আমি আত্মানন্দ ব'লে ডাকতে পারব না। ও নাম শুন্লেই আমার কত কথা মনে হয়। যাক্, সে কথা এখনই হ'বে। আমি এই এতদিন তোমাদের সঙ্গে থেকে, তোমাদের এই ধরাশীলা বিধি-ব্যবস্থা—

অহুষ্ঠান-আয়োজন, এই যে কর্তব্যের কর্তার অহুশাসন, এই দুই বৎসর এ-সব আমাকে পীড়া দিয়েছে। অবশ্য আমি এ সকল অহুষ্ঠানের বাইরে ছিলাম। কিন্তু, তোমাদের এই-সব আচার-অহুষ্ঠান দেখে আমার প্রাণে ভারী বেদনা-বোধ হ'ত। এই যে প্রাতঃকালে গন্ধার্নান ক'রে এসে প্রতিদিন সকলে মিলে স্তোত্রপাঠ কর, আমি কাণ পেতে শুনেছি; অহুভব করেছি, তার সঙ্গে তোমাদের প্রাণের কোন^০ যোগ নেই। তোমরা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত যে বুলি শিখেছ, তাই উচ্চারণ করে যাও। কারও প্রাণ এতে স্পর্শ করে না, এ অর্থাৎ বেশ দেখেছি। এ কেন? এই জড়মস্তের সাহায্যে তোমরা কি সাধনপথে এক পাও অগ্রসর হ'তে পারবে, না, পেরেছ? আমিও তো প্রতিদিন তোমাদের স্তবগাথা শুনি, শুনতে শুনতে মুখস্তও হ'য়ে গিয়েছে; কিন্তু একদিনও ঐ গাথা আবৃত্তি করবার জন্য প্রাণের মধ্যে একটুও সাড়া পেলাম না। বলবে, এ আমার দুর্ভাগ্য। আমি সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। তোমাদেরই দুর্ভাগ্য,—তাই তোমরা এই আচার-অহুষ্ঠান, এই প্রাণের সহিত যোগ-সম্পর্কহীন ক্রিয়াকলাপের নিষ্করণ চাপে পড়ে দিন দিন কেমন হ'য়ে যাচ্ছ। এই যে তোমাদের সকলেরই নামের সঙ্গে সঙ্গে একটা একটা আনন্দ,—কেউ আত্মানন্দ, কেউ বিনাশানন্দ, কেউ অদ্বৈতানন্দ, এই যে সব আনন্দের বোঝা ঘাড়ে ক'রে বেড়াচ্ছ—জিজ্ঞাসা করি তোমাদের এই ক্রিয়াকলাপ—তোমাদের এই আচার-অহুষ্ঠান—তোমাদের এই অধ্যয়ন-

অধ্যাপনা, তোমাদের এই বেদান্ত-তত্ত্বের মীমাংসা, এর মধ্যে কোথাও কি শ্রীমান্ নামী আত্মানন্দজি, আনন্দের জন্ত একটুও ফাঁক রেখেছ? যে আনন্দধারা জগৎময় হয়ে যাচ্ছে, যে আনন্দে স্নাত হ'য়ে কত দীন অসহায় নরনারী কৃতার্থ হ'য়ে যাচ্ছে, তা তোমরা উপভোগ করছ না। তোমরা কি করছ? তোমরা সেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ-প্রবাহের তীরে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রের কুটার্থ আলোচনা করছ। কোনও দিন তোমাদের জীর্ণ শীর্ণ মুখে একটুও যদি আনন্দের জ্যোতিঃ দেখতে পেতাম, আমার প্রাণে আশীর্ষক সঞ্চার হ'ত। সন্ন্যাসি! আমি আনন্দের পিয়াসী, আমি আনন্দে ভেসে যেতে চাই। তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। সংসারের মায়া-মোহ—সুখ দুঃখ—অভাব-অভিযোগ সেই আনন্দ-বাজারের পণ্য। তোমরা সেখানে যাবে? না তোমরা এই আশ্রমেই থাকবে। থেকে কি করবে জানতে চাই না। কিন্তু এই আনন্দহীন ক্রিয়াকলাপ আমার অসহ হ'য়ে পড়েছে। আবার বলছি আত্মানন্দ, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমরা বলবে, আমার মন প্রবৃত্তির দাসত্ব করছে। আমি তা অস্বীকার করব না। আমি এই দুই বছর ভেবে দেখেছি, প্রবৃত্তি আমার জন্ত নয়। আমি কঠোরতার বিরোধী। আমি চাই আনন্দের ভিতর দিয়ে আনন্দময়ীকে দেখতে পেতে। তাই দুঃখ ক'র না সন্ন্যাসি! তোমাদের সংসর্গ আমি ত্যাগ করব। আমি সংসারে ফিরে যাব।

আমাকে বাধা দিয়ে আত্মানন্দ বললেন, সে ত তোমাকে

যেতেই হ'বে। এ যে তোমার স্থান নয়—এ যে তোমার পথ নয়, সে ত গুরুদেব জানেন, আর আমিও জানি; সে কথা তো এই একটু আগেও তোমায় বলেছি। কিন্তু কিছু মনে ক'র না সুলীলা, আমি তোমার একটা কথা অবনত-মস্তকে মেনে নিতে পারছি না। শাস্ত্রচর্চায় আনন্দ নেই, জ্ঞানানুশীলনে আনন্দ নেই, এ-কথা ব'ল না সন্ন্যাসিনি!

আমি বললাম, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না সন্ন্যাসি! তুমি যে আনন্দের কথা বললে, কয়জনের তা ভোগে লাগে জানি না। আমার জ্ঞান তা ব্যবস্থিত হয় নি। আর মনের কথা খুলে বলব কি, তোমাকেও এ পথে চলতে দিতে আমার প্রাণ চাইছে না। তোমার গুরুদত্ত নাম আনন্দ ভুলিয়ে দিয়ে তোমাকে শুধু আনন্দ বলে ডেকে, আনন্দের পশরা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে তোমাকে নিয়ে ভবের হাটে যেতে ইচ্ছে করে। তুমি যাও আর না যাও, তুমি তোমার ঐ বেদান্তের মধ্যেই জীবনের সার্থকতার মধ্যে ব্যাপ্ত থাক, বাধা দেব না। তা হ'লেও আজ থেকে তোমাকে আমি আনন্দ বলে ডাকব। আবার বলছি, আনন্দ, আমাকে ভুল বুঝ না। তোমার পাণ্ডিত্য—তোমার অল্পম রূপে—তোমার অনাবিল সন্ন্যাসিতায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি তোমাকে আমার প্রবৃত্তির সহচর হ'তে বলছি না, কোনদিনও ব'লব না। আমি সে পথের সঙ্গে চিরজীবন যুদ্ধ ঘোষণা করব। কিন্তু জান কি আনন্দ, আমার জীবনের প্রথম ভাগ কি ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। সেইখানেই

কামনার—লালসার—প্রবৃত্তির যে বীজ উণ্ড হয়েছিল, আমি তা'কে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য এই স্মদীর্ঘ কাল চেষ্টা করেছি। প্রাণপণে চেষ্টা করেছি—এবং আজ অসঙ্কোচে তোমার কাছে সে কথা স্বীকার করছি। শোন আনন্দ, কিছু ঢেকে রাখব না—প্রথম যখন কলিকাতার বাড়ী থেকে পালিয়ে আসি, সে কি প্রবৃত্তির তাড়নায়? সে কি লালসার আহ্বানে? না—না—না, আনন্দ, তা নয়। প্রবৃত্তির তাড়নায়—লালসার আহ্বানে যদি পালাতাম, তা হ'লে যোগেশের সঙ্গেই ত ভেসে যেতাম। তা করিনি, তা করতে পারিনি। তারপর প্রবৃত্তির, লালসার কত প্রলোভন আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, তা ত তুমি জান আনন্দ। কত অত্যাচার আমি বুক পেতে নিয়েছি। সে আমার বৈধব্যকে অম্লান রাখবার জন্য নয়। আমি আমার বৈধব্যকে জীবনের কোন অংশেই স্থান দিই নি। আমার অপরাধ কি জান আনন্দ? আমি আমার দেবীস্বরূপিণী মাতৃ-মনে কষ্ট দিয়েছিলাম, মাতৃদ্রোহী হয়েছিলাম। সেই আমার মহাপরাধ। সেই অপরাধের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি—আরও করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ঐ যে-বলেছি আনন্দ, প্রবৃত্তিকে আমি সমূলে উৎপাটিত করতে পারিনি। স্বামীজি আমাকে যে কঠোর ব্রহ্মচর্য সাধনের আদেশ দিয়েছিলেন, তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কঠোরতার মাত্রা বাড়িয়েছি ভিন্ন কমাইনি। কিন্তু তার কি ফল হ'ল, তোমার সম্মুখেই তা দেখতে পাচ্ছি। ব্রহ্মচর্যের ফলে আমার শরীর

দুর্বল হয়ে যাবে—প্রবৃত্তি নিস্তেজ ও নিস্পীড়িত হ'য়ে যাবে। এই ত এই ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য। তা ত হ'ল না আনন্দ! এই কঠোর ব্রহ্মচর্যের ফলে আমার শরীর স্বাস্থ্যবতী হয়েছে—বলতে লজ্জা করে আমার যৌবন শতদলে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তারপর?

তারপর আমাকে বাধা দিয়ে আনন্দ বলেন—দেবী, তোমার এতগুলো কথার উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই। আমি এতকাল যে শিক্ষা লাভ করেছি, যে সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার মধ্যে তোমার এই সব প্রশ্নের, তোমার মনের এই সব ভাবের অভিব্যক্তির কোন হেতু আমি খুঁজে পাচ্ছি নে। আমি শিক্ষার্থী। কিন্তু, তুমি যে সব শিক্ষার কথা বললে, তার আলোচনা করবার সাধ্য আমার নেই। এতদিন ও-সব কথা আমার মনেও আসেনি। আমি আজীবন, আমরণ শাস্ত্রাধ্যয়ন করব, এই আমার বাসনা—এই আমার সঙ্কল্প। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমার মঙ্গলের জন্ত স্বামীজি যা আদেশ করেছেন, তা আমি পালন করেছি—ভবিষ্যতেও তাঁর আদেশই, তাঁর অগ্রশাসনেই আমার কার্য নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে তোমাকে এই কথাটা বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, তুমি তোমার জীবন-পথে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর একমাত্র নির্ভর করে চল না; তাতে তোমার পথভ্রষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়; তোমার জীবন হয় ত তা'তে বিপদসঙ্কুল হ'তে পারে। আর তা কি হয়নি তোমার জীবনে, ভেবে দেখ দেখি?

আমি বললাম, আনন্দ, আমার বয়স বেশী হয় নাই ; কিন্তু এই বয়সেই আমি যে কত বিপদ, কত প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছি, তা তুমি জান আনন্দ ! আর সেই সব বিপদ আমি কেমন করে কাটিয়ে উঠেছি, সেই সব প্রলোভন কেমন করে জয় করেছি, তাও ত তুমি জান আনন্দ !

আনন্দ আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল, কমা কর সুলীলা, তোমার এ কথা কয়টি আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি নে । তোমার সব বিপদ কেটে গেছে, প্রলোভন তোমাকে জয় করতে পারেনি, এ সকলই সত্য কথা । কিন্তু তুমি বিপদ কাটিয়েছ, তুমি প্রলোভন জয় করেছ—এমন কথা ব'ল না । তুমি কিছুই করনি সুলীলা, তোমার কিছুই করবার শক্তি ছিল না—এখনও নেই ।

পিছন থেকে জলদ-গস্তীর স্বরে ধ্বনি উঠল—আছে—আছে আস্থানন্দ—আছে ।

আমরা ভীতি-বিহ্বল হ'য়ে পিছনে চেয়ে দেখলাম, স্বামী অচলানন্দ আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ; এ বাগী তাঁরই মুখ-নিঃসৃত ।

আমরা তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছি দেখে স্বামীজি বললেন, না, না, তোমরা উঠো না, ব'সে থাক । আমি এই একটু আগেই এইদিকে বেড়াতে এসে দেখলাম তোমরা দু'জনে কি নিয়ে আলোচনা করছ, আর সেই আলোচনায় তোমরা এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছ যে, অন্ধ দিকে চাইবারও তোমাদের অবকাশ হয় নি ।

আমার ভারী কৌতূহল হ'ল তোমাদের বাদানুবাদ শুনবার। তাই তোমাদের অলক্ষিতে পিছনে এসে তোমাদের কথা শুনছিলাম। কিন্তু, তুমি আত্মানন্দ, যখন বললে যে, স্মৃশীলার কিছু করবারই শক্তি নেই, ছিল না, তখন আমি সে কথার প্রতিবাদ না ক'রে পারলাম না আত্মানন্দ! তোমার কথার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাচ্ছিলে যে, 'আমি এটা করেছি' 'আমি ওটা করেছি' এর দ্বারা 'অহং'-স্তানের প্রস্রয় দেওয়া হয় এবং সেটা ভাল নয়। কেমন, এই ত তোমার বক্তব্য?

আনন্দ এ কথার কোন উত্তর দিল না, স্বামীজির সহিত বাদানুবাদ সে কখনই করে না। স্বামীজির এ কথার উত্তর আমিই দিলাম; বললাম, আমি কিন্তু অহঙ্কার ক'রে ও-কথা বলিনি—'আমি প্রলোভন জয় করেছি' এ-কথা আমি সাধারণ ভাবেই বলিছি। আত্ম-কর্তৃত্ব-স্থাপন আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি তা ভাবিও নি। আমি করেছি অর্থাৎ আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে কাজটা হ'য়েছে; তা'তে আমার রুতিত্ব কতখানি, সে কথা আমার মনেও আসেনি। আমি কে, আমি কতটুকু, আমার শক্তিসামর্থ্য কত অকিঞ্চিৎকর, তা আমি জানি। অলক্ষ্য থেকে একজন আমাকে বল দিয়েছিলেন; সেই বলে বলীয়ান হয়েই আমার জীবনের অনেক বাধা-বিঘ্ন কেটে গিয়েছে, এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।

স্বামীজি সহাস্ত্রমুখে বললেন, শুনলে আত্মানন্দ, মায়ের কথা

শুনলে। আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম, সে কথা মায়ের মুখ দিয়েই বেরিয়ে এল। কিন্তু, ওটা ত আসল কথা নয়—আসল কথা হচ্ছে আনন্দ নিয়ে। আমাদের এই আশ্রমে সুশীলা আনন্দের সন্ধান পায়নি, তাই মা আনন্দময়ীর প্রাণ আকুল হয়েছে। তোমরা সকলে জ্ঞান-পথের পথিক আনন্দ। তা'তে যদি তোমরা তৃপ্তি না পেতে, তা হ'লে তোমরা ছুটে বেরিয়ে যেতে। সুশীলা তোমাদের এই শাস্ত্রালোচনার মধ্যে, এই জ্ঞান-চর্চার মধ্যে কোন আনন্দের খোঁজ পায়নি। এতে তার অপরাধ হয় নি। পৃথিবীতে সকলের জন্তই একমাত্র পথ নির্দিষ্ট হয় নি, হতে পারে না; বিভিন্ন প্রকৃতির জন্ত বিভিন্ন পথ, এ আমি জানি সুশীলা। তাই, তুমি যখন সব ছেড়ে অবশিষ্ট জীবন আমার এই আশ্রমেই কাটাতে ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছিলে, তখনই আমি বলেছিলাম, এ পথ তোমার জন্ত নয়, তোমাকে সংসারে ফিরে যেতে হবে। আমি ভবিষ্যৎদর্শী নই, আমি তোমাদেরই একজন। তবে, আমি আমার অভিজ্ঞতার দাবী কিঞ্চিৎ করতে পারি। আর একটু পারি এই যে, আমি মানুষ চিন্তে পারি : মানুষকে দেখলেও চিন্তে পারি, মানুষের পরিচয় অপরের কাছে শুনলেও সে মানুষকে আমি প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ চিন্তে পারি। আস্থানন্দ, সুশীলা এখানে আসবার অনেক পূর্বেই তোমার কাছে ওর কথা শুনে আমি ওকে চিন্তে পেরেছিলাম, ওর শুভানুধ্যায়ী হয়েছিলাম। তাই শ্রীভগবানের রূপায় ও আমাদের এই আশ্রমে আসতে পেরেছে। বল না মা সুশীলা, তুমি কি প্রতি পাদক্ষেপে, তোমার প্রত্যেক কার্যে কোন

অশ্রুত্যাগ শক্তির সান্নিধ্য অনুভব কর নাই? কোথা থেকে তোমার মধ্যে অমিত বল, অনন্তসাধারণ তেজ সঞ্চারিত হ'ত, তা কি তুমি বুঝতে পার নাই? এ শক্তি, এ তেজ তুমি অর্জন করেছ, এ তোমার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাই আত্মানন্দের কথা প্রতিবাদে আমি বলেছিলাম 'আছে, আছে আত্মানন্দ, এ শক্তি আমার মায়ের আছে।' সেই শক্তির বলেই স্নগীলা ওর তিনকড়িমামাকে, বড়মাসীকে হরেন্দ্রকে, রাণীকে টেনেছে,—তোমাকেও টেনেছে আত্মানন্দ,— আর আমি এই যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আমাকেও টেনেছে। এর পর আরও কত যে মা আমার টানবে তা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পারছি।

এই বলেই একটু এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে মাধব হাত রেখে স্বামীজি বললেন, মা স্নগীলা, তোমার কথা সব আমি শুনেছি, অবাক হয়ে শুনেছি। তোমার দিক দিয়ে যা বলা কর্তব্য, তা তুমি একেবারে খুলে বলেছ। তুমি আনন্দের কান্দালিনী। তা যে তোমাকে হ'তেই হবে; তুমি যে আনন্দময়ীর আদরের আদরিণী। তোমার কাছে এ সব শাস্ত্রাস্তীলন, এ সব ক্রিয়াকলাপ যে নিতান্তই শুষ্ক বোধ হবে, এ যে মহাসত্য। দেখ, আমি যখন সংসারাত্মমে ছিলাম, তোমার স্নগীলা স্নফল্য বাঙ্গলাদেশেরই অধিবাসী ছিলাম, তখন আমারই এক দেবোপম বন্ধুর মুখে একটা গান শুনেছিলাম। সেই গানটি আমার এতকাল পরে এখন মনে হচ্ছে। আমার

ধর্মবন্ধু অশ্বিনীকুমার—বরিশালের দেবতা অশ্বিনী দত্ত একদিন
গেয়েছিলেন—

‘আনি তোর মুখ-ফুলানো ভগবানের ধার খারিনে ভাই ;
আমার ঠাকুর হাসি-খুসি খেলায় ধুলোর পাগল দেখতে পাই ।

যেমন হাসি উঠলো ফুটে,

চৌদ্দ ভূবন এল ছুটে,

সৃষ্টি হল, সাড়া পেল, সবাই ধরলে তাই ।

তাই তাই তাই চলো ভেসে,

ঠাকুর খুন হেসে হেসে

হাসির তরঙ্গ কত বলিহারী যাই ।

প্রেমে সৃষ্টি গর গর (এ যে সব প্রেমের লীলা)

কাঁপে ভাবে ধর ধর,

তাল ধরলে ঠাকুর আমার, নাচিল সবাই ।

(আবার) যাই ফুরুলো বাইরের খেলা,

ভেঙ্গে গেল মহা মেলা,

ঐ হাসিতে ডুবে গেল, সাড়া শব্দ নাই ।

এ মজা ভাই দেখে দেখে,

আমিও ভাই থেকে থেকে,

সবাইয়ের সঙ্গে মিলে মিশে হাসি নাচি গাই ।

যখন আসবে সময় যাবে বেলা

ফুরাবে এই ভবের খেলা,

ডুবে যাবে হাসির মাঝে, দিন দিন দিন তাই ।

যারা মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে

তাদের বহুত দেরি হবে,

সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পস্থা নাই।

অখিনীকুমার তখন জ্ঞানের রাজ্য পার হয়ে গিয়ে ভূমানন্দের দিকে ছুটেছিল। তার কথা তখন মনে ধরে নি। আমি তখন জ্ঞান-পথের পথিক। তারপর এই এককাল জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করছি। জ্ঞানচর্চায়, শাস্ত্রাঙ্কুশীলনে যে আনন্দ নেই, এ কথা আমি বলতে পারব না। আনন্দ আছে—বিশ্বাস কর না স্ত্রীলা, এই বুদ্ধ দেবকের কথা বিশ্বাস কর—আনন্দ আছে। আমি সে আনন্দের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু, বড় কঠোর এ পথ, বহু সাধনা-সাপেক্ষ এ পথ। অখিনীকুমার পেরিয়ে গেল—আমি চলছি। আজ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমিও আনন্দের পথ পেয়েছ। কি সাধনা-বলে পেয়েছ তা আমি জানি। বলেছি, ভিন্ন ভিন্ন মাহুষের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পথ; বিশেষতঃ জানি রমণীর পক্ষে পথ আরও বিভিন্ন। জ্ঞানের পথ যে তাদের জন্ত নয়, এমন কথা বলতে পারব না। কিন্তু, তোমার পক্ষে এ পথ প্রশস্ত নয়, তুমি এর মধ্যে আনন্দ পাবে না, এ আমি জানতাম। তাই আজ যখন তোমার মুখে শুনলাম, তুমি এ আশ্রমে আনন্দ পাচ্ছ না, তোমার প্রাণ আনন্দলাভের জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, তখন আমি বিস্মিত হই নি। এ যে আমি জানতাম। এই দুই বৎসর এরই জন্তই ত তোমাকে এখানে আটক করে রেখেছি। তোমার প্রাণে আনন্দময়ীর সান্নিধ্য লাভের জন্ত, বিপুল ব্যাকুলতায় জন্তই যে

আমি অপেক্ষা করেছিলাম। এই অজ্ঞেয় বর্ষে আবৃত ক'রে তোমাকে সংসারে পাঠাব, আনন্দের হাট বসাবার জন্ত, এই ত আমার উদ্দেশ্য ছিল। আজ তা সফল হয়েছে। আশীর্বাদ করি, তোমার আনন্দের তরঙ্গে দেশ ভেসে যাক তোমার সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক।

আমি স্বামীজির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

পাঁচ

(হরেক্ষের কথা)

অল্প বিবরণ বলবার আগে আমার পরিচয়টা দেওয়া কর্তব্য মনে করছি ।

আমার নাম শ্রীহরেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় । আমার বাবা এই কানপুরে ওকালতী করতেন । এখানেই আমার জন্ম । বাবার কাছে শুনেছি, আমাদের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনায় ছিল । আমি কখনও সেখানে যাইনি, যদিও কলিকাতা মেডিকেল-কলেজেই আমি পড়েছি এবং সেখান থেকেই এম-বি পাশ ক'রে কানপুরে এসে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেছি । কালনায় আমাদের জ্ঞাতিরা নাকি আছেন ; আমিও তাঁদের চিনি না, তাঁরাও আমাদের চেনেন না—খোঁজ-খবরও নেন না । অর্থাৎ, সোজা কথায় আমরা পশ্চিমে বাঙ্গালী,—প্রবাসী বাঙ্গালী ।

আমি যখন এম-বি পাশ ক'রে এই কানপুরে এলাম, তখন আমার বাবা এখানে ওকালতী করতেন ; কাজেই নতুন ডাক্তার হ'লেও আমি এখানে অতি অল্পদিনের মধ্যেই এক-রকম পশার ক'রে নিয়েছিলাম । এই সময় আমাদেরই মত প্রবাসী বাঙ্গালী সাজাহানপুরের উকীল সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা রাণীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয় । এই বিবাহের মূল চারেক

পরেই আমার বাবা মারা যান ; মা মারা গিয়েছিলেন আমার বয়স যখন পনের বৎসর ।

আরও ছ'চারটে কথা বলা দরকার । এই বছর চার আগে একবার এ অঞ্চলে ভয়ানক প্রেগ আরম্ভ হয় । আমাদের এই কানপুরে খুব বেশী না হ'লেও এ-দিকের অন্যান্য স্থানে প্রেগের এমন বাড়াবাড়ি হয় যে, অনেক শহরের লোক বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করে । আমার খশুরবাড়ী সাজাহানপুরেও সেই সময় ভয়ানক প্রেগ আরম্ভ হয় । আমার স্ত্রী তখন সাজাহানপুরে ছিল । তার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আমি আমার খশুরকে ঐ স্থান ত্যাগ করবার জন্ত বিশেষ অত্নরোধ ক'রে পত্র লিখি । তিনি অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে আমার অত্নরোধে সন্মত হ'ন নি । তারপরই একদিন তার পেলাম যে, তিনি প্রেগে আক্রান্ত হ'য়েছেন । সেই খবর পেয়েই আমি সাজাহানপুরে ছুটে যাই । তাঁকে সজ্ঞানেই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না ।

সেই সময় তাঁর গ্রামবাসী বালাবদ্ধ দীনেশবাবু, তাঁর স্ত্রী ও বিধবা কন্যা সুলীলা তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন । দীনেশবাবু কলিকাতায় কি একটা চাকরী করতেন । স্বভাব-চরিত্র বদ্ হওয়ায় আফিসের অনেক টাকা তাদেন । সেই জন্ত তাঁর দুই বৎসরের কুমারাদও হয় । সেই সময় আমার খশুর সতীশবাবু দীনেশবাবুর কাছে প্রতিশ্রুত হ'ন যে, দীনেশবাবু যতদিন জেলে আবদ্ধ থাকবেন, ততদিন তাঁর স্ত্রী ও কন্যার ভরণ-পোষণ ও

তত্ত্বাবধান তিনি করবেন। আমি শুনেছিলাম যে, দীনেশবাবুর স্ত্রী ও কন্যা কিছুদিন কলিকাতার কম্বুলেটোলায় একজননের বাড়ীর দু'টা ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন; আমার স্বশুরই তাঁদের খরচ চালাতেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা সতীশবাবুর মনের মত না হওয়ায় তিনি তাঁদের সাজাহানপুরে নিয়ে আসবার জন্ত নিজে কলিকাতায় যান। যে দিন যাত্রা করবার কথা, তার আগের দিনই দীনেশবাবুর বিধবা কন্যা স্নশীলা নিরুদ্দেশ হন, তাঁর নাকি সাজাহানপুরে যাবার ইচ্ছা ছিল না। আমার স্বশুর দীনেশবাবুর স্ত্রীকে সাজাহানপুরে এনে নিজের বাসাতেই রাখেন।

দীনেশবাবুর দণ্ডের কাল শেষ হ'লে যে-দিন সতীশবাবু নিজে কলিকাতায় গিয়ে তাঁকে সাজাহানপুরে নিয়ে আসেন, ঠিক সেই দিনই, দীনেশবাবুর স্ত্রী কলিকাতায় যাদের বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর তিনকড়ি নামক একটি যুবক আর তার বিধবা বড় বোন মৃতপ্রায়া স্নশীলাকে নিয়ে সাজাহানপুরে উপস্থিত হ'ন। তাঁরা নাকি তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে কাশীতে এসে একদিন সন্ধ্যার পর একটা রাস্তার পাশে অজ্ঞান অবস্থায় স্নশীলাকে পান। স্নশীলার তখন বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল না। সে একবার তার মাকে দেখতে চেয়েছিল। তাই তিনকড়ি আর তার দিদি স্নশীলাকে সাজাহানপুরে নিয়ে আসে। স্নশীলা যে কুপথে যায়নি, সে যে অনেক নির্ঘাতন সহ্য করেও তার সতীত্ব-ধর্ম রক্ষা করেছে, ইত্যাদি সমস্ত কথা জানতে পেরে সতীশবাবু ও তাঁর স্ত্রী স্নশীলাকে পরম মেহে ঘরে তুলে নেন। দীনেশবাবুও ওখানকার ডিষ্ট্রিক্টারীতে

একটা চাকরী আরম্ভ করেন । এর কিছুদিন পরেই মেগে সতীশবাবু মারা যান এবং প্রাণপণে তাঁর সেবা করতে গিয়ে দীনেশবাবুর স্ত্রীও পরদিন ঐ রোগে মারা যান । আমি তখন সকলকে কানপুরে আনতে চাই । দীনেশবাবু তা'তে সন্মত হ'ন নি, কাজেই সুলীলারও আসা হয় না । তাঁরা ছোট একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে সাজাহানপুরেই থাকেন । তিনকড়ি আর তাঁর দিদিও ঔদ্দের কলিকাতার নিয়ে যাবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেও অকৃত-কার্য হ'ন । আমি আমার শাশুড়ী আর স্ত্রীকে নিয়ে কানপুরে চ'লে আসি । তার কয়েকমাস পরেই আমার ছেলে ভবশঙ্করের জন্ম হয় ।

আর কিছুদিন পরেই কি জানি কেন দীনেশবাবু কাউকে কিছু না বলে এক রাত্রিতে সাজাহানপুর ছেড়ে কোথায় চ'লে যান ; আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই রাত্রিতেই সুলীলাও সাজাহানপুর ত্যাগ করেন ।

তারপর হঠাৎ একদিন তিনকড়ি আর তার দিদি কানপুরে আসেন । তাঁরা সুলীলার কাছ থেকে এক চিঠি পান যে, সে বিপন্ন । সেই সংবাদ পেয়ে তাঁরা সাজাহানপুরে যান ; কিন্তু তার আগেই দীনেশবাবুও কোথায় চ'লে গিয়েছেন, সুলীলারও কোন সন্ধান কেউ দিতে পারে নাই । তাঁরা তখন হরিদ্বারে গঙ্গানান করতে যান । সেখানে অচলানন্দ স্বামীর আশ্রমে সন্ন্যাসিনী-বেশে সুলীলাকে পান । তাঁরা তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করেন ; সুলীলা কিছুতেই সে প্রস্তাবে সন্মত হ'ন নি । তাঁরাই দেশে ফিরবার সময় এই সংবাদ কানপুরে আমাদের দিয়ে

যান। আমার শাশুড়ী ও আমার স্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে আমরাও স্ত্রীলীলাকে ও-পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য হরিষারে যাই। আমার একমাত্র ছেলে ভবশঙ্করের মায়াতেও স্ত্রীলীলা বদ্ধ হ'ল না— সে কিছুতেই আশ্রম ত্যাগ করতে সম্মত হ'ল না। আমরা নিরাশ হ'য়ে কানপুরে ফিরে এলাম। এ প্রায় দেড় বছর আগের কথা।

এইবার মূল কথা আরম্ভ করা যাক।



ছবি

কানপুরে এখন আমরা যে বাড়ীতে বাস করছি, এটা আমাদের নূতন বাড়ী। আগে আমাদের বাড়ী একেবারে শহরের মধ্যে ছিল। সে বাড়ীর অস্থবিধা অনেক ছিল ; ভাল আলো-বাতাস সে বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারত না ; গায়ে গায়ে বসতি ছিল। সেই জন্ত বাবা শহরের একপ্রান্তে অনেকখানি জমি নিয়ে আমাদের এই বাড়ীটা তৈরী করেছিলেন ; আগের বাড়ীটা ভাড়া দেওয়া আছে। এ বাড়ীটা নিতান্ত ছোটও নয়, আর যে খুব বড় তাও নয়। বাড়ী ছোট হ'লেও চারপাশে অনেক জমি। বাবার বাগানের সখ খুব বেশী ছিল ; তিনি অবসর-সময়ে নিজে বাগানে কাজ করতেন ; সেই জন্ত বাড়ীর সম্মুখে ফুলের বাগান, দুই পাশে এবং পিছনে ফলের বাগান, শাক-সব্জীর বাগান তাঁরই যত্নে ও চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। বাবার এই বাগানের সখ উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও পেয়েছি। আমিও প্রতিদিন এখনও বাগানে কাজ করি।

একদিন বিকেল বেলায় আমি বাগানের মধ্যে কতকগুলি নূতন ফুলের গাছ বসাইছিলাম, আমার ছেলে ভবশঙ্কর আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় একখানি ভাড়াটে গাড়ী আমাদের বাড়ীর গেট দিয়ে ভিতরে এল। আমি মনে করলাম, হয় তো কোন রোগীর বাড়ী থেকে আমাকে কেউ ডাকতে এসেছে।

তাই আমি আর সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে ফুলের গাছের তদারকেই নিবিষ্ট হ'লাম।

গাড়ীখানি আমাদের গাড়ী বারান্দায় গিয়ে থামতেই গৈরিক বসন-পরা একজন সন্ন্যাসী নামলেন। তাই দেখে ভবশঙ্কর বলল, বাবা, ঐ দেখ কে এসেছে।

আমি মুখ তুলে চেয়ে দেখেই চিন্তে পারলাম, এষে হরিদ্বারের স্বামী অচলানন্দের শিষ্য ব্রহ্মচারী আত্মানন্দ।

আমি তখন তাড়াতাড়ি গাড়ী-বারান্দার কাছে গিয়ে আত্মানন্দকে অভ্যর্থনা করতে উত্তত হ'লে তিনি বললেন, হরেনবাবু, আগে গাড়ীর মধ্যে যিনি আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করুন।

এই কথা বলতে না বলতেই গাড়ীর ভিতর থেকে সুনীলাদিদি নামলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমার এ কি সৌভাগ্য! ব্রহ্মচারিণীর পদধূলি আমার গরীবথানায়!

সুনীলাদিদি হেসে বললেন, ডাক্তারবাবু, দৃষ্টিশক্তি কি ক্ষীণ হয়েছে? কোথায় ব্রহ্মচারিণী! সে হরিদ্বারে গলায় ডুবে মরেছে— আমি আপনাদের সুনীলা।

আমাকে আর কথা বলতে হ'ল না; গাড়ী আসার শব্দ পেয়েই রাণী বাহিরের বারান্দায় এসেছিল। সুনীলাদিদিকে দেখেই দৌড়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল, দিদি, কি সৌভাগ্য!

সুনীলাদিদি রাণীর মুখচুষন করে বললেন, কৰ্ত্তা গিন্নী দুই-জনেরই এক কথা—সৌভাগ্য! সৌভাগ্য যে আমার। কিন্তু

যাকে দেবর্ষবার জন্ত সেই হরিষ্যার থেকে ছুটে এসেছি, আমার সে নন্দহলাল কৈ ?

এই ব'লে এদিক ওদিক চাইতেই একটু দূরে ভবশঙ্করকে চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, স্নশীলা ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে বল্লেন, ওরে আমার সাত রাজার ধন মাণিক ! তোর জন্তই যে আমি এখানে এসেছি। এত দিনে আমার বুক জুড়িয়ে গেল রাণী, আমার বুক জুড়িয়ে গেল।

দেখতে দেখতে সেখানে আমার শাশুড়ীর আবির্ভাব। স্নশীলা-দিদি ছেলে বুকে করেই নতজাহ্ন হ'য়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বল্লেন, কাকীমা, আমি বাড়ী এসেছি। আশ্রম থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।

আমার শাশুড়ী স্নশীলাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, মাগো, তখন তুমি স্নশীলা ছিলে না, তখন যে ব্রহ্মচারিণী, তাই আমাদের মায়ী কাটিয়েছিলে। কিন্তু, আশ্রম থেকে ফিরবার সময় আমি হরেনকে বলেছিলাম, আমার স্নশীলা আবার আমার কাছে আসবে। মনে আছে হরেন, আমি এ কথা বলি নি।

স্নশীলাদিদি বল্লেন, কাকীমা, তোমার কথা কি বিফল হয়। তাই দেখছ না, তোমার মেয়ে তোমার কোলে এসেছে। আর এনেছেন কে জান কাকীমা, এই বেটা বাছুর। এই ব'লে স্নশীলা ভবশঙ্করের মুখ চুখন করলেন। আর হেঁলেও এমনি যে, একটু আপত্তিও করল না ; পরম আনন্দে স্নশীলা-দিদির বুক নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিল।

ব'লে উঠল, তোমরা বেশ ত। স্বামীজিকে যে কেউই অত্যাধিকার করলে না। স্বামীজি, মনে কিছু করবেন না, দিদিকে পেয়ে আমরা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম।

আত্মানন্দ সহাস্ত্রমুখে বললেন, এই দৃশ্যই আমি মানস-নেত্রে কল্পনা করতে করতে এসেছিলাম। মা আনন্দময়ী, এই ত তুমি আনন্দের হাট বসিয়ে নিলে; এখানে নিরানন্দময়, কঠোর বৈদাস্তিক আনন্দের স্থান ত নেই মা!

আত্মানন্দ হুই হাত উর্ধ্বে তুলে কার উদ্দেশে যেন নমস্কার করলেন; তারপর বললেন, আর বাহিরে কেন মা, আনন্দময়ীকে ঘরে ভুলুন। আমি যে ফেরত গাড়ীতেই হরিদ্বার যাব।

রাণী দৌড়ে গিয়ে আত্মানন্দের হাত চেপে ধরে বলল, সে আর যেতে হয় না বৈদাস্তিক! আপনাকে আমরা বেঁধে রাখব। এস তো বাবা শঙ্কর, ধর তো এই সন্ন্যাসীর আর একখানা হাত। দেখি উনি কেমন করে ছাড়িয়ে যান।

সুশীলা-দিদি আত্মানন্দের দিকে চেয়ে বললেন, দেখছ কি আনন্দ, বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছ। তোমার ফেরত-গাড়ী যে কবে আসবে, তাই আমি ভাবছি।

আমি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম; এইবার বললাম, আর বাহিরে দাঁড়িয়ে কেন? শঙ্কর, কোল থেকে নেমে তোমার মাসীমাকে ঘরে নিয়ে যাও। গুরা যে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছেন।

সুশীলাদিদি বললেন, ডাক্তারবাবু, এই বিছা নিয়ে বুঝি রোগীর চিকিৎসা করেন, রোগ-নির্গম করেন। আমাদের ক্লান্তি

দেখলেন কোথায় ? রাণী, ডাক্তারের ঐ চসমাটার পাওয়ার বাড়িয়ে দিও বোন। না, না, আর এখানে নয় ; আমার রাজ্য-পাট আমি বুঝে নিই গে, কেমন কাকীমা !

আমার শাশুড়ী বললেন, এই দিনেরই তো প্রতীক্ষা করছিলাম, মা স্নশীলা !

‘আমি বললাম, পেটে কিছু পড়েছে, না শুধুই আনন্দ।

আস্থানন্দ বললেন, পেটেও কিছু পড়ে নি, আনন্দেরও সীমা নেই। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছি ডাক্তারবাবু।

আমি বললাম, তা হ’লে ভাগই হ’ল, গরীবের খরচ বেঁচে গেল।

তারপর আর কি। আমার বাড়ীতে সত্যসত্যই আনন্দের হাট ব’সে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্নশীলাদিদি যেন কি এক আনন্দের, স্ফূর্তির তরঙ্গ বহিয়ে দিলেন। এ মেয়েটা যাহু জানে না কি ?

বাড়ীর মধ্যে আনন্দ-কোলাহল, বাহিরে স্বামী আস্থানন্দের সঙ্গে আমি স্নশীলাদিদির সম্বন্ধেই আলোচনায় মগ্ন। স্নশীলাদিদি যে কেন এতদিন পরে আশ্রম ত্যাগ করে এলেন, তারই বিবরণ স্বামীজির কাছে শুনলাম।

প্রায় ষণ্টাখানেক পরে মা এসে বললেন, বাবা হরেন, ওরা ত একেবারে আনন্দেই মাতোয়ারা হ’য়েছে। রাত হ’য়ে যাচ্ছে, স্বামীজির সেবার কি কোন নূতন ব্যবস্থা হবে, না উনি আমাদের রান্নাই সেবা করবেন।

আস্থানন্দ সহাস্তমুখে বললেন, মা, ‘সেবা’ কপাটা বলবেন না,

ওতে অপরাধ হয়। আমি তো রাত্রে কিছু খাই নে, দিনের বেলায় একবার শাকার, যা যোটে তাই খাই। আজ রাত্রে আর কিছুই খাব না, তবে স্নান করতে হ'বে।

মা বললেন, এই শীতের মধ্যে স্নান! না, না, স্নান ক'রে কাজ নেই, হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন। আপনি একাহারী তা জানি। কিন্তু, আজ তো দিনের বেলায় আহার হয় নাই, এখন আহার করুন, তাতে দোষ নেই।

আত্মানন্দ বললেন, মাতৃঅজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাপ। বাক আমি স্নান করে নিই, তারপর একটু দুধ খাব। তা হ'লেই হ'বে। আর কিছু দরকার হ'বে না। মা স্মৃশীলারও যে আজ দিনমান অনাহারে গেছে। তাঁর জন্ত—

আত্মানন্দের কথা আর শেষ হ'তে পারল না, শব্দরকে কোলে নিয়ে রাণীর হাত ধ'রে স্মৃশীলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করে বললেন, তাঁর জন্ত কি আনন্দ!

আত্মানন্দ বললেন, তোমার তো সারাদিন অনাহারে গেছে, সেই কথা বলছিলাম।

স্মৃশীলাদিদি বললেন, সারাদিন যে ভাবে গেছে, সারারাতও সেই ভাবেই যাবে। কাকীমা, আপনি ব্যস্ত হ'বেন না। আজ আমার উপবাস। ওতে আমার কষ্ট হয় না। যত দিন আশ্রমে ছিলাম, আমি কোন দিন অন্ন গ্রহণ করি নি, কলমূলই খেয়েছি, মাসের মধ্যে দশদিন অনাহারেই কাটিয়েছি। আজও তাই। কাল সকালে এই ছদ্মবেশ ত্যাগ করব। এই গৈরিক বস্ত্র যে আজও

আমি ত্যাগ করিনি। কাল এই বেশ ত্যাগ ক'রে তারপরে অল্প ব্যবস্থা। আজও আমার ভূমিশয়া মা! আনন্দ, তুমি উপবাসী থেকে না। যাও, স্নান করে নাও, তারপর যা হয় কিছু খেও।

আমি বললাম, স্বামীজির আজ দুঃখ-পথ্য ব্যবস্থা হ'য়েছে। আর আপনার জ্ঞান কি ব্যবস্থা করতে হ'বে দিদি, তা আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে লেখে না; সে ব্যবস্থা মা আর রাগী করবেন। অতএব, স্বামীজি, আপনি বাথরুমে যান, গরম জল আছে, দেয়ী করবেন না। আপনার দুঃখ-পথ্য দ্বিগুণে তবে ডাক্তার অল্প-পথ্য করবেন। মা, আজ আমি স্বামীজির সঙ্গে এই পাশের ঘরেই শোব। ওঁরা দুই বোনে শঙ্করকে নিয়ে থাকবেন। আজ কি আর ওঁদের ঘুম হ'বে।

এই ডাক্তার ঠিক কথা বলেছেন, এই ব'লে, স্নানাদিদি রাগীকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। মাও ওঁদের সঙ্গে গেলেন। আত্মানন্দ বাথরুমে গিয়ে স্নান করে এলেন। তারপর একটু দুঃখ পান করে বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনি এইবার আহাশ ক'রে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি; আপনার সঙ্গে অনেক আলোচনা করতে হ'বে।

আমার নিরম, যত রাত্রিতেই শুই না কেন, ভোর পাঁচটার সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবেই। আমি তখনই উঠে, হাতমুখ ধুয়ে, বাগানে গিয়ে মালীদের সঙ্গে কাজ করি। ইহাই আমার ব্যায়াম।

যে দিনের কথা বলেছি, তার পরের দিনও যথাসময়ে বাগানে কাজ করত গিয়েছি, দেখি স্নানাদিদি তার আগেই উঠেছেন।

আমাকে বাগানের মধ্যে দেখে তিনি সেখানে এলেন। আমি এত ভোরে তাঁকে দেখে বললাম, মিদি, রাতে বোধ হয় আপনার ঘুম হয় নি।

তিনি হেসে বললেন, ডাক্তারসাহেব সাধক রামপ্রসাদের একটা গান শোনেন নি। তিনি গিয়েছেন—

ঘুম ভেঙ্গেছে, আর কি ঘুমাই
 যোগে যোগে জেগে আছি।
 যার ঘুম তাঁকে দিয়ে
 ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।

আমারও তাই হয়েছে। তা সে-কথা এখন থাকুক। আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি। এর পরে তো সময় পাওয়া যাবে না। আপনি রোগী নিয়ে বসবেন, তারপর বেরিয়ে যাবেন। শুনলাম আপনি সেই একটা ছুটোয় ফেরেন। তারই জন্ত এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। একটা কাজ করতে হবে ভাই। আপনি যখন বেরিয়ে যাবেন, তখন টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে তিনকড়ি-মামাকে একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন। তাকে জানাবেন যে, আমি এখানে এসেছি। তিনি যেন বড়-মাসীমাকে নিয়ে অবিলম্বে এখানে আসেন। তাঁরা দু'জন না এলে আমার কর্তব্য স্থির হচ্ছে না। এখন আপনারা, আর তাঁরা দু'জনই আমার সহায় বলুন, সম্পদ বলুন, সব। তিনকড়ি-মামার নাম শ্রীতিনকড়ি মিত্র; ঠিকানা, ১৭ নম্বর রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।

হরিদ্বারে স্বামীজিকেও একটা তার করতে হ'বে। আনন্দের যেতে তিন চারদিন বিলম্ব হ'বে, সেই কথাটা আশ্রমে জানাতে হ'বে। আরও একটা কথা বলব কি ডাক্তার সাহেব ?

আমি বললাম, আপনি সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন দিদি। আমরা যে আপনার আদেশ পালনের জন্ত সর্বদাই প্রস্তুত।

দিদি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, দেখুন, আজ প্রায় দু' বৎসর হ'তে চলল বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছেন। ব্যাপার যে কি হ'য়েছিল, তা আমি কাউকে বলি নি, বলা কষ্টকর, পিতার দুর্বলতার কথা কন্টার মুখ দিয়ে বের হ'তে চায় না। সে কথা আর একদিন আপনাদের কাছে বলব। এখন এই দু' বৎসরের মধ্যে বাবার কোন সন্ধান নিই নি, নিতে ইচ্ছাও করে নাই, স্মৃতিশক্তিও হয় নাই। কাল থেকে মনে হচ্ছে, যখন লোকালয়ে এলাম তখন বাবার কি হ'ল সে সংবাদ নেওয়া কর্তব্য। তিনি বেঁচে আছেন, কি মারা গিয়েছেন, কিছুই জানি নে। যদি দেহ-ত্যাগ করে থাকেন, তা হ'লে তো সকল যজ্ঞকার, সকল প্রলোভনের হাত এড়িয়েছেন। আর যদি বেঁচে থাকেন, তা হ'লে কোথায় কি-ভাবে আছেন, তার একটু সন্ধান নিতে হয়। আপনি যদি নানা ধরনের কাগজে একটু বিজ্ঞাপন দেন, তা হ'লে হয় তো তাঁর সন্ধান মিলতে পারে।

আমি বললাম বেশ, আজই সে ব্যবস্থাও করা যাবে। দু'টো তারও দশটার মধ্যেই পাঠিয়ে দেব।

তা হ'লেই হবে। আমি যাই, আর বিলম্ব করতে পারছি
নে, আপনার ঘর-গৃহস্থালী আমাকে ডাকছে। এই বলে তিনি
চলে গেলেন; আমি অবাক হয়ে সেই দেবী-প্রতিমার দিকে
চেয়ে রইলাম।



সাত

পরদিন আমার হাতে পাঁচ-ছয়টা শক্ত রোগী ছিল ; সেই জন্ত অল্পদিন অপেক্ষা একটু আগেই বে'র হ'তে হয়েছিল ; ফিরতে দেবী হ'য়ে গিয়েছিল । আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন বেলা প্রায় দু'টো । মধ্যে মধ্যে এমন বিলম্ব আমার হ'য়েই পড়ে ; বাড়ীর কেউ সেজন্ত ব্যস্ত হয় না । ডাক্তারেরা পরের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ত খুব উপদেশ দিয়ে থাকেন ; যথাসময়ে স্নান-আহার, বিশ্রাম করা যে শরীর ভাল রাখবার জন্ত বিশেষ দরকার, এ কথাও সর্বদা বলেন ; কিন্তু নিজেদের বেলায় সে বিধান লঙ্ঘন ক'রে থাকেন ; তাঁদের স্নান-আহারের নির্দিষ্ট সময় নেই । অর্থ-উপার্জনের নেশায় যে ডাক্তারেরা এমন করেন, তা'ও অনেক ক্ষেত্রে ঠিক নয় ; রোগীর চিকিৎসার ভার নিলে সর্বপ্রথমে সে-কর্তব্য পালন করতে হয় । এই কারণেই তাঁরা নিজেদের শরীরের দিকে চাইবার অবকাশ পান না । কে জানে বেলা চারটে, বা সাতটা একটা, রোগীর বাড়ী থেকে ডাকতে এলেই ডাক্তারকে ছুটতে হয়—এ তাঁর কর্তব্য কর্ম । বিশেষতঃ, আমি রোগীর আহ্বানে স্থির থাকতে পারি নে । এখন যেতে পারব না, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে বে'র হ'তে চায় না । তাই আমাকে বেলা একটা-দু'টোর কমে প্রায়ই বাড়ী ফেরা হয় না, অবশ্য সে জন্ত যে অর্থাগমও বেশী হয়, এবং মনেও আনন্দ হয়, এ কথাও গোপন করতে পারি নে ।

যাক সে আলোচনা। আমি দু'টোর সময় বাঁধী এসে দেখি শ্রীমান্ তিনকড়ি বৈঠকখানায় একখানি ইঞ্জিচেয়ারে শুয়ে পা নাচাচ্ছেন। আমি তো অবাক। কাল বেলা এগারটার সময় তাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, দুই-একদিন পরে তিনকড়ি তার দ্বিদিকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবে; এখন দেখছি টেলিগ্রাম পাওয়া-মাত্রই তারা ছুটে এসেছে।

আমাকে দেখেই তিনকড়ি লাফিয়ে উঠে হাত-জোড় করে বলল, আদাব, ডাক্তারসাহেব! মেজাজ সরিফ!

আমি হেসে বললাম, ব্যাপার কি হে তিনকড়ি বাবু? তোমরা কি আমার টেলিগ্রামের জঞ্জ হাঁ করে ব'সে ছিলে?

তিনকড়ি বলল, ডাক্তারসাহেব, কাগজ-কলম, লজ্জুস বেচে থাই; কোন দিন কোন কারণে কেউ কখন আমার মত সামান্ত দোকানদারকে চিঠি পর্য্যন্ত লেখে না, টেলিগ্রাম তো দূরের কথা। কাল যখন, এই বেলা দু'টো-আড়াইটার সময় পিয়ন এসে বলল, তিনকড়ি মিত্রের নামে তার আয়া হায়, আমার তখন ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল—আমার নামে তার! আমি যে কি করব, কি বলব, ভেবেই পাই নে,—একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম! আমার সেই ভাব দেখে পিয়ন বলল বাবুজি, এই কাগজটায় সহি করে তার নিন, আমি দাঁড়াতে পারিনি। তখন আর কি করি কাঁপতে কাঁপতে রসিদ লিখে দিয়ে তারটা তো নিলাম। তারপর, খুলতে আর সাহসে কুলায় না, তারখানি হাতে করে চূপ করে বসে রইলাম।

এমন সময় বড়-দি এসে বললেন, কি রে তিনকড়ি, অমন ক'রে ব'সে আছিস যে ? হাতে ওটা কি ?

আমার তখন হাঁস হলো। আমি বললাম, একটা টেলিগ্রাম।

দিদি বললেন টেলিগ্রাম ! কে তোকে টেলিগ্রাম কয়ল ? তা' অমন ক'রে ব'সে আছিস কেন ? খুলে দেখ্ কে তোকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

তাই তো ! তখন খামটা ছিঁড়ে কাগজখানা বের করে পড়ে দেখে একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

দিদি বললেন, কি রে ? কি খবর ?

আমি বললাম, জয় বাবা বিশ্বনাথ ! বড়-দি, ভারি সুখবর ! কানপুর থেকে ডাক্তারবাবু তার করেছেন তোমাকে আর আমাকে অবিলম্বে সেখানে যাবার জন্ত। মা সুশীলা কানপুরে এসেছে। সেই আমাদের ডেকে পাঠিয়েছে। আর বিলম্ব নয় বড়-দি ! এখনই যেতে হবে। আমি একবার দোকানে গিয়ে সব ঠিক করে আসি, জেনে আসি গাড়ী কখন ছাড়বে। তুমি যা হয় দু'চার খানা কাপড়, গরম গায়ের কাপড়, খান দুই কয়ল ঠিক করে নাও। স্নমুখে যে গাঁড়ী পাওয়া যাবে, তাতেই যাওয়া।

তারপরে আর কি ! রাত্রে পঞ্জাব-মেল ধরে এই খানিকটা আগে আপনাদের তিনকড়ি দিদিকে নিয়ে উপস্থিত। দেবী কয়বার কি উপায় ছিল ডাক্তারসাহেব ? মা সুশীলার আদেশ ! জানেন তো, সেই সে-বার একদিন বিলম্ব ক'রে সাজাহানপুরে

গিয়ে আর মাকে সেখানে দেখতে পাই নি। তাই তো এবার ছুটে এসেছি ডাক্তারসাহেব। কেমন, ভাল করি নি। ও-মেয়েটার কি বুদ্ধির স্থির আছে? হয় তো কালই কোথায় চ'লে যেতো। যাক—ঠিক এসে গেছি! দেখেছেন, নিজের কথাই পাঁচ কাহন! আপনি যান, ন্নান-আহার ক'রে স্থির হোন; তারপর গল্প করা যাবে, তিনকড়ি শশ্মা আজই ফিরে যাচ্ছেন না, বুঝলেন?

আমি বললাম, যেতে চাইলেই অমনি যাওয়া। এবার বেধে রাখবার অস্ত্র এনে ঘরে রেখেছি। এই ব'লে আমি ভিতরে যাবার জন্তু পা বাড়িয়েছি, অমনি তিনকড়ি ব'লে উঠল, বাঃ বাঃ, আচ্ছা লোকের বাড়ীতে এসেছি. তো! একবার বললেনও না যে, ও হে তিনকড়ি, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

আমি বললাম, বাড়ী কি আমার তিনকড়ি? এ যে তোমাদেরই বাড়ী! এতদিন পরে কি সে-কথাটাও জানিয়ে দিতে হ'বে?

তিনকড়ি হাত-ঘোড় করে বলল, অপরাধ হ'য়েছে ডাক্তার-সাহেব! মূর্খ মানুষ, অত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে তো কানপুরের ডাক্তারসাহেবই হ'তে পারতাম, কলকাতার চিৎপুর রোডে লজ্জেলুস্ বিক্রী করতাম না।

আমি বললাম, এই বেলা তিন শ্রহর পর্য্যন্ত লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে চিৎপুর রোডের দোকানে ব'সে লজ্জেলুস্ বিক্রী করা ঢের ভাল তিনকড়ি! যাক, আমি এখন

কাপড়-চোপড় ছেড়ে ছুঁটো খেয়ে নিই। তুমিও একটু নিজা দাও, গাড়ীতে নিশ্চয়ই ঘুমতে পার নি।

তিনকড়ি বলল, ঘুম! বসবার জায়গা যে পেয়েছিলাম এই ভাগ্যি! দিদি তো সারা পথ গাড়ীর মেজেতে ঠায় বসে কাটিয়েছে। গরীব দোকানদার মাহুৎ, বেশী ভাড়ার গাড়ীতে তো চড়বার সামর্থ্য নেই; আমাঙ্কের, সেই সনাতন এক-শো এগার নম্বর। যান, যান, এখন আর কথা কইবেন না; খেয়ে আস্থন, আমার দিনে ঘুম হয় না। আমি রাজা রাজবল্লভের মত এই সিংহাসনে ব'সেই পা নাচাব।

আমি তখন ভিতরে যেতেই তিনকড়ির বড়-দিদি এসে বললেন, বাবা, তোমার এত দেরী হোলো! রোজই কি এমন হয়?

আমি বললাম, দশ ছয়োরে ঘুমতে হয়, তাই দেরী হ'য়ে যায়। এমন প্রায়ই হয়।

তিনি বললেন, আহা, তোমার যে ভারি কষ্ট হয় বাবা! আর এরাও তোমার অপেক্ষায় না খেয়ে ব'সে থাকে।

আমি বললাম, মাসী-মা, আমি ব'লে ব'লে হাররাণ হয়েছি যে, আমার জন্ত যেন কেউ অপেক্ষা না করেন। কিন্তু মা-ও সে কথা শুনবেন না, রাণীও শুনবে না। এখন, আপনি এসেছেন, ওঁদের ঐ প্রথাটা যদি ভেঙে দিতে পারেন।

আমি উপরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে একখানি সোকার শুয়ে বিছান করছি, এমন সময় রাণী এসে বলল, বাঃ, তুমি তো

আচ্ছা মাহুয, হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছ. আর তোমার অপেক্ষায় তিনকড়ি মামা না খেয়ে বসে আছে।

আঁ, কি বলছ ? তিনকড়ির কি খাওয়া হয় নাই ?

রাণী বলল, আমরা কত বললাম, কিছুতেই মামা খেতে রাজী হোল না, বলল, গৃহস্থামী আনুন, :তবে একসঙ্গে খাব। এ দিকে গৃহস্থামী নিশ্চিন্ত মনে আরাম করছেন।

আমি তখন তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাকলাম, ওগো তিনকড়িবাবু, এ দিকে একবার আসতে হ'বে।

তিনকড়ি নীচে থেকেই জবাব দিল, জী হজুর, যাতা হ'।

ওরে বাবা! একেবারে খাস হিন্দী বাত্! তিনকড়ি উপরে এসে বলল, সেলাম পৌছে মহারাজ! বন্দা হাজির।

আমি বললাম, এ কি ব্যাপার! আমার অপেক্ষায় তুমি না খেয়ে ব'সে আছে! তা, সে কথা বলতে হয়। আমি মনে করেছিলাম, তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে নীচে বিশ্রাম করছ!

তিনকড়ি বলল, আপনি মনে করতে পারেন ডাক্তার-সাহেব। কিন্তু এই তিনকড়ি মিস্তির না হয় লেখা-পড়াই না জানে; কিন্তু কায়তের ছেলে তো, আর সেও যেমন-তেমন কায়ত নয়—একেবারে কুলীন—এখনও ফৌস করে। তার তো আদব-কায়দা জ্ঞান আছে। গৃহ-স্থামীকে ছেড়ে সে খাবে কেমন করে ?

আমি বললাম, তোমার যে এমন আদব-কায়দা-জ্ঞান, তা জানতাম না তিনকড়ি। কিন্তু, তুমি আমার উপর. অবিচার

করেছ; একটু আগেই বলি নি, এ বাড়ী আমার নয়— তোমাদের। তুমি বুঝি তা ভাব না—মামা-খণ্ডর হও কি না সম্পর্কে। কেমন?

তিনকড়ি বলল, “না বাপু, আমি ও-সব খণ্ডর টমুর হতে পারব না—আমি তোমাদের দাসাত্মদাস তিনকড়ি মিত্র। স্মৃশীলা আর রাণী ভালবেসে মামা বলে ডাকে। হাঁ, আজ যদি সতীশবাবু বেঁচে থাকত, তা হ’লে বড় গলা ক’রে বলতাম, আমি সতীশ চাটুর্ঘ্যের শালা। সে যে আমার কত বড় গোরবের সম্বন্ধ ছিল হরেনবাবু, তা কাকে বলব। সব গিয়েছে। সতীশবাবু নেই, ছোটমাসী নেই, আছেন, বড়-দিদি আর আমার ছোট-দিদি রাণীর মা, আর রাণী, আর ঐ ভবশঙ্কর। স্মৃশীলা থেকেও ছিল না ডাক্তারবাবু, আপনার রূপায় আজ তাকে মনে হচ্ছে ফিরে বুঝি পেলাম। কিন্তু—

তিনকড়ির কথা শেষ না হ’তেই স্মৃশীলা-দিদি ঘরের মধ্যে এসে বললেন, আর কিছু নয়, বেলা তিনটে বাজে যে! নীচে ভাত দেওয়া হয়েছে। জামাইবাবু গা তোলো ভাই, তিনকড়ি মামা যে না খেয়ে বসে আছে।

কাজেই বাগাড়ম্বর তখনকার মত মূলতুবী রেখে আহাির অদ্বৈষণে নীচে যেতে হোলো।



আতি

পাঁচটার সময় শহর থেকে তিন মাইল দূরে এক গ্রামে একটা রোগী দেখতে যাওয়ার কথা। স্নাতরাং ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রামের পরই আবার সাজ-গোছ করতে হোলো।

নীচে নেমে দেখি, বৈঠকখানার পাশের ঘরে স্বামী আত্মানন্দ আর তিনকড়ি মহা গল্প জুড়ে দিয়েছে। আমি সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে বললাম, যাবে তিনকড়ি, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে। আপনিও আসুন না স্বামীজি।

তিনকড়ি বলল, কিছু মাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু, আপনি যে এমন ধড়াচুড়া পরে বেড়াতে বেরুচ্ছেন, এতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ তো বেড়াবার বেশ নয় ডাক্তারসাহেব।

আমি হেসে বললাম, বেড়ানোও হ'বে, আমার একটা জরুরী রোগী দেখতেও হ'বে। এই এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রামে যেতে হ'বে। আপনারা গাড়ীতেই ব'সে থাকবেন; আমি এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই রোগী দেখে ব্যবস্থা করে ফিরে আসব। তারপর খুব একটা চক্র দিয়ে বাড়ী ফেরা যাবে। কি বলেন?

স্বামীজি বললেন, সে কথা ভাল। আমাদের বেড়ান হ'বে, আপনার পকেটেও কিছু রৌপ্য মুদ্রার আবির্ভাব হ'বে। মন্দ কি! এই ব'লে তিনি শয্যা ত্যাগ করলেন; তিনকড়িও

উঠে বলল, বাবা, এখানে যে শীত। একটা কক্সল টম্বল গায়ে জড়িয়ে নিই।

সেই সময় স্নীলা-দিদি সেই ঘরের মধ্যে এসে বললেন, কোথায় গমন হচ্ছে সবার।

আমি বললাম, বিশেষ কোথাও নয়। আমি একটা রোগী দেখতে যাচ্ছি, ওঁরাও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছেন।

স্নীলা-দিদি ঠাট্টা ক'রে বললেন, রোগীর অবস্থা বোধ হয় সঙ্গীন, তাই টেনে বার করবার জ্ঞান সঙ্গীর দরকার! দেখ আনন্দ, তুমি কিন্তু রোগীর মাথার দিক ধোরো।

আমি বললাম, দিদি, আপনি তো আমার রোগীর পরম শুভামুখ্যায়িনী দেখছি। না, না, তেমন সঙ্গীন অবস্থা নয়। আর রোগী নয় রোগিনী। বড়-মানুষের স্ত্রী। সামান্য একটু জ্বর হ'য়েছে, হয় তো ঠাণ্ডা লেগেছে। তাই ডাক পড়েছে ডাক্তার-বাবুর। বড়-মানুষের ব্যাপার। হয় তো দুই এক দাগ মিক্‌সচার দিলেই আরাম হ'য়ে যাবে। আমার ষোলটা টাকা পাওনা আছে, না দিয়ে যাবে কোথায়?

দিদি বললেন, অতি উত্তম সংবাদ! কিন্তু, কথা হচ্ছে এই যে, তাড়াতাড়ি তার করে বড় মাসীমা আর তিনকড়ি মামাকে আনা হোলো। ওঁদের তো আর অকারণ বসিয়ে রাখা যাবে না, কাজকর্ম ছেড়ে ওঁরা তো বেশী দিন থাকতে পারবেন না। তাই বলছি, তোমরা একটু সকাল সকাল ফিরে এসো। আজ সন্ধ্যার পরই আমাদের একটা পরামর্শ-সভা বসাতে হ'বে।

আমি বললাম, আজকের দিনটা ক্ষমা করতে হ'বে দিদি !
ওঁরা কাল সারারাত গাড়ীতে ব'সে কাটিয়েছেন, আজ যদি
আবার রাত বারোটা পর্যন্ত মজলিস বসে, তা হ'লে ওঁদের
প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হ'বে। অতএব আমি প্রস্তাব
করছি, আজ আর আমাদের মজলিস বসবে না, আজ বিশ্রাম।
কাল সন্ধ্যার পর আমাদের পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশন হ'বে।
ওহে তিনকড়ি, তুমি প্রস্তাব সমর্থন কর।

তিনকড়ি বলল, সুলীলা দেখছি মহা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে।
তা ভয় কি? আমরা কালই পালাচ্ছি নে। দুই-তিন দিন
আছি, চাই কি পাঁচ-সাত দিনও থাকতে পারি। মৃতরাং
আজই কর্তব্য-নির্ণয়ের জন্ত তাড়াতাড়ি কি? আর কর্তব্যই
বা এমন কি? ষ্টেশনে যাওয়া, কলকাতার কয়েকখানা
টিকিট কেনা, তারপর রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে আমার গরীব-
খানায় উপস্থিত হওয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে গঙ্গানান করা,
তারপর আহালাদি শেষ করে বিশ্রাম, গল্প, ঠাকুর-দেখা,
রামায়ণ-মহাভারত পড়া। বাস্, এই তো কর্তব্য! এর জন্ত
আবার পরামর্শ কি। তবে একটা বিশেষ কথা আছে। না,
এখন সে কথা থাক্। রাত্রে ফিরে এসে বলব, না হয় কালই
বলব। এ কদিনই যখন বলি নি, তখন একটা দিন আর কি?

দিদি বললেন, এমন কি কথা তিনকড়ি মাশা, যা এত দিন
গোপন করেছে।

তিনকড়ি হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, শুনেছেন ডাক্তার-সাহেব!

শুনলেন স্বামীজি মহারাজ, যতই শাস্ত্র পড়ান, আর যতই গেকর্যা পরান, ফলমূল ভোজন করান, মেয়ে-জাতের ঐ যে গোপন কথা জান্‌বার জন্ত একটা আগ্রহ তা কিছুতেই যাবার নয়। দেখলেন ত, কি এমন কথা, তাই জান্‌বার জন্ত ওর কেমন ব্যগ্রতা! তা, যতই ব্যস্ত হও না, আজ এখনই আমি সে গোপন কথা ভাঙছি নে। তুমি যতই ভাব না কেন, সে কথার উদ্দেশ্যই পাবে না। সে-কথা এক আমি জানি, আর জান্‌তেন সতীশবাবু! যাক্‌ গে, চলুন হরেন্দ্রবাবু, আপনার রোগিনীর চিকিৎসা ক'রেই আসা যাক্‌।

দিদি বললেন, আমার এই তিনকড়িমামার পাগলামি কোন দিন যাবে না। হরিদ্বারে আচার্য্যদেব ওকে ওরই জন্ত ভারি ভালবাসতেন।

তিনকড়ি বলল, আর বললে না যে, তোমার আচার্য্যদেব বলেছেন, আমি মুক্ত পুরুষ! যেমন-তেমন লোকের সার্টিফিকেট নয়—স্বয়ং আচার্য্যদেব। দেখো, এবার কল্‌কাতায় গিয়ে দোকানের স্মুখে ঐ কথা লিখে একটা সাইন-বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেব। তখন আমার দোকানের সিগারেট রোজ পাঁচ-সাত বাস্ক বিক্রী হ'বে। মহাপুরুষের সার্টিফিকেট—যে সে কথা নয়।

দিদি বললেন, তবে আর কি! তিনকড়িমামা তো আমার কর্তব্য স্থির করেই কেলেছে। আর পরামর্শ-সভার কোনই দরকার নেই। কল্‌কাতায় চল, রাজা রাজবল্লভের প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হও। তিনকড়িমামার দোকানের আয়ে জীবনযাত্রা

নির্বাহ কর; তারপর যথাসময়ে কাশীমিত্রের ঘাটে যাও ! একেবারে নিরাপদ পস্থা ! কি বল আনন্দ !

কাউকেই কিছু বলতে হোলো না—ডাক-পিয়ন এসে সমস্ত বলা-কওয়ার মোড় একেবারে ফিরিয়ে দিল। একখানি চিঠি !

চিঠি আমার নামে, মোড়কের উপরের হস্তাক্ষর আমার পরিচিত। চিঠি লিখেছেন বৃদ্ধ ডাক্তার গ্রেহাম;—সেই ডাক্তার সাহেব যিনি আমার শ্বশুরের জীবিত অবস্থায় মৃত-প্রায় দ্বিদি স্নানীলার চিকিৎসা করে মরণের দুয়ার থেকে টেনে এনেছিলেন।

ডাক্তার গ্রেহাম বিলাত থেকে সর্বদাই আমাকে চিঠি লিখতেন। আমার শ্বশুরের পরলোক গমনের পর তিনি আমার কাছ থেকেই সকলের সংবাদ নিতেন। প্রতি পত্রেই স্নানীলাদিদি আর তিনকড়ির সংবাদ জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদ ও ভারত-গবর্ণমেন্টের চাকুরী হইতে অবসর-গ্রহণের সংবাদও যথাসময়ে আমাকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি যে পুনরায় ভারতবর্ষে আসবেন, এ কথা কোন দিনও আমাকে জানান নাই। অকস্মাৎ পুণা থেকে তিনি এই পত্র লিখেছেন। তিনি যা ইংরাজীতে লিখেছেন, তার সার মর্ম এই—

প্রিয় ডাক্তার হরেক্ষনাথ,—

আমি তোমাকে পুণা থেকে পত্র লিখছি, এ দেখে তুমি আশ্চর্য্য বোধ করবে। আমি যে এ দেশে আসব, এর সম্ভাবনার কথাও কোন দিন তোমাকে জানাই নাই। ইঠাৎ আমি এ দেশে আসা স্থির করেছিলাম !

পেল মেলে আমি বোম্বাই নেমেই পূণায় এসেছি। আমার মামার ছেলে এখানকার সিবিలిয়ান ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁরই বাড়ীতে আমি আতিথ্য স্বীকার করেছি।

বিলাতে আমার আর কোন বন্ধনই নেই। চিররোগিনী স্ত্রীকে নিয়ে লণ্ডনের নিকটবর্তী এক পল্লীতে কিছু দিন কাটিয়েছি, তারপর তিনি মারা গেলেন; আমার আর আপনার বলতে কেউ রইল না। মাস কয়েক কেটে গেলে মনে হোলো, আমার যৌবন ও প্রোচের কর্মভূমিটা একবার জন্মের শোধ মেখে আসি। তাই আমি এখানে এসেছি। হয় তো আবার ফিরেও যেতে পারি, অথবা জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন এখানেও কাটাতে পারি। সে-কথা এখনও ঠিক করি নাই।

কয়েক মাস পূর্বে তোমার যে পত্র পেয়েছিলাম, তাতে তুমি লিখেছিলে, সুলীলা তখনও হরিদ্বারে এক স্বামীজির আশ্রমে আছেন, তিনকড়ি কলকাতায় আছেন। আমি তাদের দুই জনকেই একবার দেখতে চাই। বলতে কি, আমার ৫-দেশে আসবার অন্ততম আকর্ষণই তারা। তুমি এই পত্র পাওয়ারমাত্র আমাকে লিখবে, সুলীলা এখনও হরিদ্বারে আছে কি না। আর তিনকড়ির কলকাতার ঠিকানাটাও আমাকে জানিও। তোমার পত্র পেলে তবে আমি আমার ভ্রমণের প্রোগ্রাম ঠিক করব এবং তোমাকে জানাব। বাওয়ার সময় কানপুর থেকে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। পূর্বে সংবাদ দেব, তুমি দুই-এক দিনের অবকাশ করে নিও। আমার সম্পূর্ণ ভ্রমণের প্রোগ্রামই তোমাকে পাঠাব।

অতএব অতি সত্বর পুণার ঠিকানায় আমাকে পত্র লিখো এবং যে যে সংবাদ জানতে চেয়েছি, তাহা লিখো। ভরসা করি তোমরা কুশলে আছ।

তোমাদের শুভাৰ্থী

এ, গ্রেহাম্

আমি যখন পত্রখানি পড়ছিলাম, তখন সকলেই উদ্গ্রীব হ'য়ে আমার দিকে চেয়েছিল। আমি পত্রপাঠ শেষ করে বললাম, এই দেখ আর এক ব্যাপার। দিদি, আপনার কর্তব্য আর আমাদের স্থির করতে হ'বে না। পৃথিবীতে আপনার সৰ্ব্বাপেক্ষা যিনি হিতৈষী, তিনি আসছেন। মনে আছে দিদি, সাক্ষাহানপুরের সেই বুড়ো ডাক্তার গ্রেহামকে। তিনি আপনাকে ও তিনকড়িকে দেখবার জন্ত বিলাত থেকে এই বৃদ্ধ বয়সে ছুটে এসেছেন। তিনি সে-দিন বোম্বাই পৌঁচে পুণাতে তাঁর মামাতো ভাইয়ের ওখানে উঠেছেন। আপনারা দুই জন এখন কোথায় আছেন, তাই জানবার জন্ত আমাকে চিঠি লিখেছেন। আমার কাছ থেকে সংবাদ পেলেই তিনি দিন স্থির করে আমাকে লিখবেন এবং এখানে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বারে যাবেন। তারপর তিনকড়িকে দেখবার জন্ত কলকাতায় যাবেন। তারপর যে কি করবেন, তা এখনও ঠিক করেন নি।

এই কথা শুনে তিনকড়ি একেবারে লাক্ষ্মিরে উঠে বলল, দেখলে মা সুশীলা, কেমন যোগাযোগ। ও গো বড়-দি শীগুগির এসো। রুগী, সুসংবাদ শুনে বাও।

তিনকড়ির চীৎকার শুনে সবাই দৌড়ে এলেন। আমি তখন ডাক্তার গ্রেহামের পত্রের কথা সকলকে বললাম। রাণী বলল, আর দেবী কোরো না, এখনই যাও। ডাক্তার সাহেবকে তার করে দেও যে, তাঁকে কোথাও যেতে হ'বে না; তাঁর আশীর্ব্বাদে সবাই এখানে মিলেছেন। তিনি যেন পরের ট্রেণে রওনা হন। আরও বোলো যে, তিনি এখানে এসে আমাদের গরীবথানাতেই অতিথি হ'বেন। যাও, আর দেবী কোরো না গো। তার ক'রে দিয়ে তারপর তুমি তোমার রোগী দেখতে যেও, বুঝলে।

সুশীলা-দিদি এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নাই, চুপ করে সব সংবাদ শুন্ছিলেন। রাণীর আদেশ-প্রদান শেষ হ'লে, বললেন, আনন্দ, কিছু বুঝলে কি? এমন সংযোগ হবার জন্মই আমি আশ্রম ছেড়ে এখানে এসেছি। আর আমার ভয় নেই আনন্দ। স্বয়ং আনন্দময়ী ক্রমে সব ঠিক করছেন। আনন্দ, তোমাকে যে আরও কয়েকদিন এখানে থাকতে হচ্ছে! সে মহাত্মাকে না দেখে, তাঁর কথা না শুনে তো তুমি আশ্রমে ফিরে যেতে পার না।

রাণী বলল, সে কথা আর বলছ কেন দিদি। স্বামীজিকে থাকতেই হ'বে। দিদি, এরই নাম প্রাণের টান। কোথাকার বিদেশী সাহেব, কবে তোমার চিকিৎসা করেছিলেন। আর দেখ দেখি, তিনি সে কথা ভুলতে পারেন নি। ঠুঁকে যখনই চিঠি লিখেছেন, তখনই তোমাদের মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছেন। আর কি না, এই শোকজীর্ণ বৃদ্ধ সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে তোমাদের দেখবার জন্য এদেশে এসেছেন। একে কি বলবে দিদি।

‘দিদি বললেন, এ সব তাঁরই রূপা—তাঁরই রূপা। তিনি যে দয়াময়, আনন্দময় বোন !

রাত ন’টার সময়ই আমার টেলিগ্রামের উত্তর এলো। ডাক্তার গ্রেহাম তার করেছেন—Your guest reaches Cawnpur Monday morning seven.

তোমার অতিথি সোমবার প্রাতঃকালে সাতটায় কানপুরে পৌঁছাবে।

তার পেয়ে আমরা সবাই খুব আনন্দিত হ’লাম। সেদিন শুক্রবার। মধ্যে দুই দিন। এই দুই দিনের মধ্যে ডাক্তার সাহেবের অভিযর্থনার ব্যবস্থা করতে হ’বে। যে কয়দিন তিনি দয়া করে আমার বাড়ীতে থাকবেন, তাঁর কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ’বে।

রাণী বলল, ‘আমাদের বাগানের মধ্যে যে ছোট একতলা বাড়ীটা আছে, সেইখানেই সাহেবের থাকবার ব্যবস্থা করতে হ’বে। সন্মুখে ছোট একটা বারান্দা আছে, একটা ড্রয়িং রুম আছে; দু’পাশে দু’টো শোবার ঘর আছে, বাথ-রুম আছে। বেশ নিরিবিলিতে বুড়ো মানুষ থাকবেন। ওখানে যা সামান্য আসবাব-পত্তর আছে, তাতে হ’বে না। এ বাড়ী থেকে কিছু নিয়ে যেতে হ’বে, দু’চারটে জিনিট কিনতেও হ’বে। বাড়ীটা বেশ করে সাজিয়ে ফেলতে হ’বে। আর এক কাজ করতে হ’বে। সাহেবদের যে হোটেল আছে, সেখান থেকে সাহেবের থানা আনবার ব্যবস্থা করতে হ’বে। হোটেলের দুই জন

খানসামাকে, সাহেব যে কয়দিন থাকবেন, সেই কয়দিন দিন-রাত হাজির থাকবার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

তিনকড়ি বলল, সব ভার হোটেলের উপর দিলে চলবে না, তোমাদের দ্রোপদীকেও সে কয়দিন যোড়শোপচারে বাঙ্গালী খানার আয়োজন করতে হ'বে। সাহেব না খান, আমরা তো আছি; তোমার জিনিষ নষ্ট হ'বে না রাণী, এ কথা আমি ব'লে দিচ্ছি।

বড় মাসীমা হেসে বললেন, তোর পাগলামি আর কোন দিন গেল না তিনকড়ি!

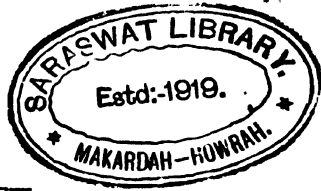
তিনকড়ি বলল, পাগলামি কি হোলো। আচ্ছা বৌদি, আপনিই বলুন তো, আমি ঠিক কথা বলিনি। সাহেব যদি কোন দিন খাবার সময় দিশী খানা খেতে চান, তখন কি করবে—রহড়কা দাল আর মোটা রুটি দিতে পারবে? তারই জন্ত বলছি।

সুশীলা-দিদি বললেন, তার জন্ত ভাবতে হ'বে না তিনকড়িমামা।

তিনকড়ি বলল আর এক কথা বলি। ঐ যে তখন একটা কথা বলি বলি করেও চেপে গেলাম, তা আর আমাকে বলতে হ'বে না। ঝাঁর কথা তিনিই যখন আসছেন তখন তাঁর মুখ থেকেই শুনতে পাবে। এখন এখানেই সভা শুরু; সকাল-সকাল শয়ন ক'রতে হ'বে, কাল যে সারারাত ব'সে কেটেছে।

আমার শাশুড়ী বললেন, আমিও সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। রাণী! ঠাকুরকে বল, সকলের খাবার দিক। আর দেবী ক'রে কাজ নেই।

তিনকড়ি বলল, তথাস্তু।



নব্ব

সোমবার। সেই পৌষ মাসের ভয়ানক শীতের রাত্রি প্রভাত না হ'তেই রাণী উঠে প্রথমে বাড়ীর সকলকে জাগিয়েছে। তারপর আমার কাছে এসে চোঁচাচ্ছে, ও গো ওঠো, কখন চারটে বেজে গিয়েছে। আজ আর পাঁচটার সময় উঠলে চলছে না।

আমি নিদ্রাজড়িত অবস্থাতেই বললাম, এখনই তাড়াতাড়ি কি? গাড়ী আসবে সেই সাতটা বাইশ মিনিটে, ঢের সময় আছে।

রাণী বলল, শোন কথা। এখন উঠে সব ঠিক আছে কি না দেখে-শুনে তবে তো ষ্টেশনে যেতে হবে। আমি সবাইকে ডেকে তুলেছি। তোমার গাড়ী তো ঠিকই আছে। আর যে ছু'খানা গাড়ীর কথা বলা আছে, লছমনকে তাদের ঊঁখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের পাঠিয়ে দিয়ে সে ঐ পথে হোটেলো যাবে। সেখান থেকে খানসামাদের ডেকে দিয়ে ষ্টেশনে চলে যাবে। তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি ত রোজ পাঁচটায়ই ওঠো; আজ না হয় ষণ্টা খানেক আগেই উঠলে। ও কি, আবার বে লেপ টান্ছ। না, না, লক্ষ্মীটি, এখন ওঠো। আমার সারারাত ঘুম হয় নি। এই বুদ্ধি সকাল হ'য়ে গেল, এই ভয়ে আমি ভেগেই আছি। ওঠো, হাত-মুখ ধুয়ে একবার বাগানের ঘরটা ঠিক করে সবাই মিলে একটু আগে থাকতেই ষ্টেশনে যাই। কি জানি,

গাড়ী যদি একটু আগেই আসে, তা হ'লে কি হবে ? ডাক্তার সাহেব স্টেশনে নেমে কাউকে না দেখলে কি মনে করবেন ?

সেই সময় স্নীলা-মিদি এসে বললেন, আচ্ছা মেয়ের পালায় পড়া গিয়েছে। নেও, এখন চল স্টেশনে যাই। তোমার তাড়ায় সবাই প্রস্তুত হয়েছে, এখন গেলেই হয়।

কি করি, সেই শীতের মধ্যেই উঠতে হোলো। তারপর বাগানের সেই ঘরে গিয়ে দেখি খানসামা দুইজনই এসেছে। তারা ষ্টোভ জ্বলে জল গরম করতে আরম্ভ করেছে—রাগীর যে তাড়া!

ছ'টা বাজবার আগেই গাড়ী এসে পড়ল। আর দেবী সহল না; তখনই স্টেশনের দিকে যাত্রা করা গেল। বাড়ীতে ধাইয়ের জিন্মায় ভবশঙ্করকে রেখে বাড়ীশুদ্ধ সবাই স্টেশনে গেলাম। ট্রেন আসবার তখনও তিন কোয়ার্টার বিলম্ব। সবাই ওয়েটিং-রুমে আশ্রয় নেওয়া গেল।

যথাসময়ে ট্রেন এলো। ফার্স্ট ক্লাসের একটা কামরা থেকে ডাক্তারসাহেব নামলেন। আমাদের সকলকে স্টেশনে দেখে তিনি একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন। আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করলে তিনি হাসি-মুখে বললেন, হরেঞ্জ, তোমাদের এখানে কি এখন জুন মাস? এই শীতে সবাই এসেছ আমার অভ্যর্থনা করতে। এ জান্নলে আমি আপে থাকতে সংবাহই দিতাম না।

স্নীলা-মিদি বললেন, আপনি খবর না দিলেও আমরা জানতে পারতাম—যোগবলে!

ডাক্তারসাহেব বললেন, তা তুমি জানতে পারতে স্নীলা।

এ কথা আমি বিশ্বাস করি। ওয়েল তিনকড়ি, তোমার চৈহারা তো একটুও বদল হয় নি; যেমন দেখেছিলাম, তেমনই আছ। বেশ, বেশ। এখন চল, তোমাদের দৌলতখানার যাওয়া যাক। তোমাদের তো ভারি কষ্ট দিলাম।

তিনকড়ি বলল, আপনি কষ্ট দেন নাই সাহেব, যা কষ্ট দিয়েছে এই রাণী। সেই রাত তিনটেয় সবাইকে জাগিয়েছে ঐ মেয়েটা।

ডাক্তারসাহেব রাণীর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, এ যে আমার সতীশের মেয়ে। এত আপনার জন থাকতে আমি এত দিন মনে করেছি, সংসারে আমার কেউ নেই। হরেঙ্গ, আমার সে ভ্রম দূর হোলো। এই বুড়োর জন্তু বিধাতা এখানে এত মেহ'জম করে রেখেছেন, তা তো আমি জানতাম না। চল, আর শীতে কষ্ট পেয়ে কাজ নেই।

আমাদের বাড়ীতে এসে সমস্ত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত দেখে সাহেব খুব আনন্দিত হ'লেন; বললেন হরেঙ্গ, তোমরা আমার জন্তু যে আয়োজন করেছ, আমি কিন্তু এ-সব আশা করি নি; আর এ রকম আড়ম্বর আমি ইচ্ছেও করি নি। তোমার বাড়ীতে এসে ঠিক তোমাদের মত থাকব, এই আমি আশা করেছিলাম। তোমরা আমাকে সাহেব মনে ক'রে এ সব করেছ, তা আমি বুঝতে পারছি। আরে পাগল, আমি যদি সাহেবের মতই আস্তাম, তা হ'লে সাহেবদের হোটেল ছিল, ডাক-বাংলা ছিল, সেইখানেই, উঠতাম, তোমাদের নিমন্ত্রণই গ্রহণ করতাম না। যাক গে, সে কথা আর এখন ব'লে লাভ নেই।

আমি বিনীত ভাবে বললাম, আপনি এজন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ; এ সকল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের জন্ত দায়ী রাণী আর সুশীলা-দিদি ।

রাণী বলল, আমরা এমন কি ব্যবস্থা করেছি, যার জন্ত আপনি আপত্তি করছেন ।

সাহেব বললেন, আপত্তি করছি নে ; যা করেছ তা তোমাদের উপযুক্তই হ'য়েছে । কিন্তু, একটা কথা বলে রাখি, আমার জন্ত বিলাতী খানার ব্যবস্থা কোরো না । অনেকদিন এ দেশ ছেড়েছি, বাক্সালা দেশেও অনেকদিন যাই নি । যে কয়দিন এখানে থাকব, রাণী আর সুশীলার বাক্সালা রান্নাই আমার আহার হবে । আমি তোমাদের ডাল-চচ্চড়ি খেতে বড় ভালবাসি, জান্লে সুশীলা !

দিদি বললেন, বেশ, তাই হ'বে ; এখন তো একটু চা খান ; তারপর সে ব্যবস্থা হবে । তিনকড়িমামা সে কথা আগেই ব'লে রেখেছিল ।

সাহেব বললেন, তোমরা আমাকে এখনও ভাল ক'রে চেন নাই । কিন্তু সেই কতদিন আগে মিন কয়েকের জন্ত তিনকড়ির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ; সেই সময়ই ও আমাকে চিনে ফেলেছিল, আমিও ওকে চিনেছিলাম । এতদিনেও আমি তিনকড়িকে ভুলি নি ; আর তারই জন্ত এত লোক থাকতে আমি ঐ যুবক তিনকড়ির উপরই সুশীলার ভার দিয়ে নিশ্চিত মনে দেশে চলে গেছিলাম ।

তিনকড়ি বলল, অযোগ্য ব্যক্তির উপর ভার দিলে যা হয়,

তাই হ'য়েছে ; সুশীলা মায়ের জন্ত আমি কিছুই করতে পারি নি । যখন ঘোর বিপদে পড়ে আমার সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেছিল, তখন কলকাতা থেকে ছুটে সাজাহানপুরে গিয়েও তার বিপদে উদ্ধার করতে পারি নি । হরিদ্বারের আশ্রমে যখন সুশীলা ব্রহ্মচর্যা গ্রহণ করেছিল, তখনও তার মত পরিবর্তন করাতে পারি নি । এখনও যে তার জন্ত কিছু করতে পারব, তা আমার মনে হয় না ; স্মৃতরাং আমার দ্বারা কোন কাজ হয় নি, হ'বার সম্ভাবনাও নেই ।

ডাক্তার সাহেব বললেন, তোমার সাধ্য কতখানি, তা তোমার চাইতে আমি বেশী জানি তিনকড়ি । সে-সব কথা এখন নয় । বুড়া মাহুধ, সুদীর্ঘ পথ একটানে টেঁগে এসেছি । একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছে । এখন আমার বিশ্রামের দরকার হয়েছে । সব কথা বিকেলে, না হয় সন্ধ্যার পর হবে ।

আমি বললাম, চল, সবাই আমরা যাই, উনি বিশ্রাম করুন । এই বলে সকলকে নিয়ে আমি বাগান-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম ।

বিকেল-বেলায় ডাক্তারসাহেব তিনকড়িকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেন । যাবার সময় আল্লাকে ডেকে বললেন, হুরেদ্দে, তোমাদের রাত্রে ডিনার একটু সকাল-সকাল শেষ কোরো । রাত্রিতে আমার অনেক কথা জানবার আছে ।

আমি বললাম, আমরাও সুশীলা-দিদির সঙ্ঘে অনেক কথা জানি নে ; রাত্রিতে সে-সব শোনা যাবে । আর অন্তঃপর দিদির কি করা কর্তব্য, সে-সঙ্ঘেও আপনার আদেশ পাওয়া দরকার । তার জন্তই টেলিগ্রাম ক'রে তিনকড়ি আর তার দিদিকে

আনিয়েছি। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আপনিও ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন।

ডাক্তারসাহেব বললেন, সে-সব কথা রাত্রিতে হ'বে। এখন আমি একটু বেড়িয়ে আসি। এই ব'লে তিনকড়িকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেড়াতে গেলেন।

সেদিন রাত্রি সাড়ে-আটটার মধ্যেই সকলের আহার শেষ করতে হ'ল। ডাক্তারসাহেব অতি সামান্য জলযোগ করলেন; সাহেবী প্রথায় সন্ধ্যার পর ডিনার করলেন না।

ন'টা বাজতে না বাজতেই সকলে আমাদের বাগানের ঘরে উপস্থিত হ'লেন। রাণীই প্রথমে কথা বলল, আজকের আমাদের এই মহাসভার সভাপতি ডাক্তারসাহেব হোন, আমি এই প্রস্তাব করছি।

স্বামী আত্মানন্দ সহাস্ত-বদনে দণ্ডায়মান হ'য়ে বললেন, শ্রীমতী রাণী দেবীর প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। আমাদের আজকের এই সভার কার্য-পরিচালনা করবার উপযুক্ত ব্যক্তিই তিনি।

তিনকড়ি বসে-বসেই বলল, এর উপরে আর কথা নেই। কিন্তু, আমি বলি কি, ও-সব সভাপতি, সভাপত্রীর কোন প্রয়োজনই নেই। সুলীলা-মা তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলুক, তারপর ডাক্তারসাহেব যা বলবেন, তাই সুলীলা মাথা পেতে স্বীকার করবে, আমরাও জয়ধ্বনি করব। ও-সব কথা-কাটাকাটি আমি বুঝিনে। ঐ যে কলকাতায় এক রাত-তিথারী এক দিন

আমাদের দোকানের স্তম্ভে গান করেছিল, “অত বোঝাপড়ার কাজ নেই রে মন, বোঝো সোজা, চল সোজা।” ভিথিরীর ঐ কথাই আমি বেদবাক্য করেছি—বোঝ সোজা, চল সোজা।

ডাক্তারসাহেব বললেন,—তিনকড়ি, তুমিই ঠিক কথা বলেছ— বোঝ সোজা, চল সোজা। এর চাইতে ভাল উপদেশ আর নেই। এখন সুশীলা, তুমি বল তো, সতীশের মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত তুমি কি করেছ? সব কথা খুলে বল দেখি।

সুশীলা-দিদি অতি ধীরভাবে বলল, আপনি যখন আদেশ করেছেন, তখন আমাকে তা পালন করতেই হ’বে। কিন্তু, কষ্ট হ’য়ে পিতার দুর্বলতার কথা বলতে যে আমার বড়ই কষ্ট হ’বে। উপায় নেই, আমার জীবনের এই অধ্যায়টা আপনাদের অজ্ঞাত থাকলেই ভাল হ’ত।

ডাক্তারসাহেব বললেন, তোমার যদি কষ্ট বোধ হয়, তা হ’লে সে কথা নাই বা বললে। কিন্তু, দুই বৎসর হরিষারে আশ্রমে অমন মহাত্মার আশ্রয় ত্যাগ করে হঠাৎ তুমি চ’লে এলে কেন, সেই কথাটা আমরা জানতে চাই।

আত্মানন্দ স্বামী বললেন, সে কথা গুর চাইতে আমিই ভাল ক’রে বলতে পারব। আশ্রমে উনি আমাকে সব কথা খুলে বলেছিলেন। এই ব’লে আত্মানন্দ স্বামী, সুশীলা-দিদির সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হ’য়েছিল, সে কথা আত্মোপাস্ত বললেন।

স্বামীজির কথা শেষ হ’লে সুশীলা-দিদি বলল, আমার যা

বলবার ছিল, আনন্দ তা বলেছেন। এখন আপনারা আমার কর্তব্য স্থির করুন।

তিনকড়ি বলল, এই মুর্খ তিনকড়িকে যদি জিজ্ঞাসা করেন ডাক্তারসাহেব, তা হলে আমি বলব, আর সে কথা আজ সকালেও বলেছি, যে সুশীলা-মা আমাদের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে আমরা যেমন আছি তেমনি থাকুক। ও-সব বড় বড় কথা আমি বুঝি নে। বড়-দিদি আর সুশীলা-মা যদি আমার পিছনে থাকে, আর দিন-রাত আশীর্বাদ করে, তা হ'লে এই যে তিনকড়ি মিত্তিরকে দেখছেন, ইনি মানুষ হ'য়ে যাবেন। অতএব তিনকড়িকে মানুষ করাই আপাততঃ সুশীলা-মায়ের কর্তব্য। তারপরে যা হয় সে পরে দেখা যাবে। এই হ'ল আমার কথা। তবে বলেছি তো, ডাক্তারসাহেব যা বলবেন, আমরা তা মাথা পেতে নেব, কোন আপত্তি করব না।

আমি বললাম, ডাক্তারসাহেব যদি বলেন, তিনকড়ি, তুমি সকলকে নিয়ে কলকাতায় যাও। সেখানে গিয়ে তোমার বড়-দিদি একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে-শুনে তোমার বিয়ে দেবেন; আর সুশীলা-দিদি তোমার সেই বোকে নিয়ে ঘর-সংসার করবেন, তা হ'লে তোমাকে তা মাথা পেতে নিতে হ'বে।

তিনকড়ি লাক্ষ্মিয়ে উঠে বলল, দেখুন দেখি, ডাক্তার কোন্ কথার মধ্যে কি কথা এনে ফেললেন। আমার কর্তব্য নিয়ে তো কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে সুশীলা-মায়ের কর্তব্য নিয়ে। তার মধ্যে আমার কথা কেন? আমি কে?

ডাক্তার সাহেব বললেন, তুমি কে, এই কথা জিজ্ঞাসা করছ তিনকড়ি? আমি এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছি। তোমরা হয় তো শোন নি যে, যখন আমি এ-দেশে ছিলাম তখন হিন্দু-জ্যোতিষ-সম্বন্ধে আমি কিছুদিন আলোচনা করেছিলাম। একজন হিন্দু-সন্ন্যাসীর সাহায্যে সে সময় পেয়েছিলাম; তিনি আমাকে মানুষের করকোণী বিচারের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর কিছু দিন নানা কারণে জ্যোতিষের চর্চা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। স্নানীলা যখন পীড়িত হ'য়ে সাজাহানপুরে আসে, তখন আমি সেখানে ছিলাম এবং স্নানীলার চিকিৎসার ভার সতীশ আমার উপর দিয়েছিল, এ কথা তোমরা জান। সেই সময় আমি হঠাৎ স্নানীলার হাত দেখেছিলাম, এবং পূর্বের শিক্ষার ফলে আমি তার কর-কোণীর বিচার করেছিলাম। সুধু স্নানীলার কেন, আমি তখন সতীশ ও তিনকড়ির হাতও দেখেছিলাম। তারপর যখন আমি ছুটি নিয়ে বিলাত যাই, সেই সময় সতীশকে সব কথা বলেছিলাম। তিনকড়ির উপরই তখন আমি স্নানীলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছিলাম। সতীশের জীবন-কাল যে তখন সংক্ষেপ হ'য়ে এসেছিল, তা আমি তার কর-কোণী বিচার করে জানতে পেরেছিলাম। তাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র হ'লেও আমি তার উপর স্নানীলার ভার দিই নাই। সে সময় আমি স্নানীলার জন্ম ব্যাঙ্কে সামান্য কিছু টাকা জমা করে দিয়েছিলাম এবং সে-টাকা ব্যয় করবার অধিকার তিনকড়িকে দিয়েছিলাম; তবে ব্যাঙ্কের উপর আমার আদেশ ছিল যে, টাকা জমা দেবার

পর দেড় বছরের মধ্যে যেন তিনকড়িকে এ সংবাদ বা দেওয়া হয়, কারণ আমি স্নুশীলার হাত দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আরও কিছু বিপদ তার হ'বে এবং তিনকড়ি সে সময় তাকে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। এই মাসকয়েক আগে তিনকড়ি ব্যাঙ্ক থেকে সংবাদ পেয়েছে। কেমন তিনকড়ি, তুমি সংবাদ পাও নাই।

তিনকড়ি বলল, হ্যাঁ, আমি সংবাদ পেয়েছিলাম। সে-কথা এত দিন কাউকে বলি নি; আজ যখন বলব ব'লে মনে করেছিলাম, তখন আপনার আগমনের সংবাদ পেয়ে কথাটা চেপে গেছিলাম। সকলে ও-কথাটা আপনার মুখ থেকেই শুনবেন, তাই আমি বলি নি।

ডাক্তারসাহেব বললেন, বেশ করেছিলে। তারপর আরও কথা শোনো। স্নুশীলার পিতা দীনেশ বাবুর হাত আমি দেখি নি, কিন্তু, তার চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটা ভাল নয়। ভবিষ্যতে তার দ্বারা যে অনর্থ ঘটতে পারে, সে কথা আমি তখন সতীশকে বলেছিলাম। স্নুশীলা যদিও বিশেষ বিবরণ বলতে কষ্ট বোধ করল, তা হ'লেও আমি কেন, তোমরাও বুঝতে পেরেছ যে, স্নুশীলার অকস্মাৎ সাজাহানপুর থেকে চ'লে যাবার কারণ তার বাবা। যাক সে কথা। আজও বিকেলে আমি কোশলে স্নুশীলার হাত দেখেছি; স্নুশীলা তা বুঝতে পারে নি। সন্ধ্যার পূর্বে তিনকড়িকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার সময় তার হাতও আমি দেখেছি। আমার জীবন স্বত্ব্যর পর থেকে আমি আবার জ্যোতিষের চর্চা আরম্ভ করেছি। বিলেতে অনেকের ঠিকুজি

মিলিয়েছি, অনেকের করকোণী বিচার করেছি। পূর্বে যতটুকু শিক্ষালাভ করেছিলাম, এখন তার থেকে আরও বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। স্মৃতরাং স্মৃশীলার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আমি কিছু নির্দেশ করতে পারব। এর জন্ম আমাকে একটু সময় দিতে হ'বে। ঐ যে ষ্টীল ট্রাকটা দেখছ, ওর ম'ধ্য আমার কাপড়-চোপড় নেই, আছে কতকগুলি জ্যোতিষের পুঁথি, আর আছে অনেকগুলি হাতের আলোক-চিত্র ও ঠিকুঞ্জি। আমি আজ রাত্ৰিতে সেই সব আর একবার পরীক্ষা করব এবং তাই নিয়ে আলোচনা করব। তা হ'লে স্মৃশীলার করকোণী বিচার ভাল করে করতে পারব, এবং আমি আলোচনা করে যে নির্দেশ পাই, কা'ল তোমাদের জানাব। অতএব, আজ তোমাদের সভা-ভঙ্গের আদেশ দেওয়া ব্যতীত আমার গতাস্তর নাই।

আমি বললাম, কাল রাত্ৰি ঝেঁপে কেটেছে। আজ আর কোণ্ঠি-বিচার করে কাজ নেই। আমরা যাই, আপনি বিশ্রাম করুন। কাল আপনার ঐ ট্রাক খুলে যা করতে হয় করবেন।

ডাক্তারসাহেব হেসে বললেন, হরেন্দ্র, তুমি কি জান না, যে, আমি হাজার চেষ্টা করলেও ঘুমতে পারব না, আমার মাংস মध्ये ঐ সব করকোণীই আনাগোনা করবে।

আমি বললাম, সে কথা খুব ঠিক। তা হ'লে আমরা যাই, আপনি বাস্তু খুলে বসুন, বোধ হয় আজ আর বিছানার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হ'বে না।

ডাক্তারসাহেব হাসতে হাসতে উঠে পাড়ালেন।

আমরা ঘরে ফিরে এসে ডাক্তারসাহেবের কথাই আলোচনা করতে বসলাম। তিনকড়ি বলল, ডাক্তারসাহেব বিলেত যাবার সময় কলকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে যে পঁচ হাজার টাকা জমা দিয়েছিলেন, আর আমাকেই যে সূশীলার জন্ত সেই টাকা খরচ করবার অধিকার দিয়েছিলেন, সে কথা কি আমি তখন জানতে পেরেছিলাম। এই মাস পঁচ-ছয় আগে ব্যাঙ্ক থেকে যখন আমার কাছে চিঠি এল, তখন আমি একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম। সাহেব এই দুনিয়াতে আর লোক পেলেন না, সূশীলার জন্ত আমানত টাকার খরচের অধিকার দিয়ে গেলেন এই লক্ষ্মীছাড়া, মূর্খ তিনকড়ির উপর। এ যে তাঁর কি সুবিবেচনা, আমি তা ভেবেই পাই নে। আমি তখনই ঠিক করেছিলাম, আমি এ ভার নেব না; সব টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়ে সূশীলাকে দিয়ে আসব। আমার মত অতি সামান্ত দোকানদারকে যিনি বিশ্বাস ক'রে এত টাকা দিতে পারেন, তিনি পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিছু তাঁর যে বিষয়-বুদ্ধি একটুও নেই, সে কথা আমি এক-শ বার কেন, হাজার বার বলব। কি বলেন ডাক্তারবাবু?

আমি কিন্তু বলবার আগে রাগী ব'লে উঠল, তুমি জান না তিনকড়িমামা, ডাক্তারসাহেব বাবার সঙ্গে পরামর্শ কবেই এ কাজ ক'রেছিলেন। শুনে না সাহেবের মুখে, তিনি বুঝতে পেরে-

ছিলেন বাবা আর বেশী দিন বাঁচবেন না ; তাঁর উপর দিদির' ভার দেওয়া, না দেওয়া বৃথা হ'বে । কাজেই তিনকড়িমামাকেই দিদির অভিভাবক ক'রেছিলেন । আর সে কাজ যে খুবই ঠিক হ'য়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তিনকড়িমামার মত দিদির শুভানুধ্যায়ী আর কে আছে ?

তিনকড়ি বলল, কেন, তুমি কি তিনকড়ির চাইতে কম । তোমার মা কি আমার চাইতে স্নানীলার বেশী আপনার নয় । সতীশবাবুর অভাবে বৌ-দিদিই যে স্নানীলার প্রধান অভিভাবক ।

বড় মাসীমা বললেন, তিনকড়ির এ কথা খুবই ঠিক । সত্যই তো, বোমা ছাড়া স্নানীলার আপন জন আর কে আছে ? আমরা কে ? আমার ভগিনীপতির বাড়ীতে স্নানীলা আর তার মা ভাড়াটে ছিলেন । মনে নেই তিনকড়ি, যতপ্রায় স্নানীলাকে নিয়ে যখন আমরা প্রথম সাজাহানপুরে যাই, তখন সব কথা ভুলে গিয়ে কে স্নানীলাকে কোলে তুলে নিয়েছিল । সে সতীশবাবু আর বোমা ! স্নানীলার মা কি বলেছিল তখন, তা কি আমি ভুলেছি ? সে সতীলক্ষ্মী তার মেয়ের কলঙ্ক তখনও ক্ষমা করতে পারে নাই । সে সময় ঐ বোমা যদি আশ্রয় না দিত, তা হ'লে সেইদিনই স্নানীলাকে আমরা হারাতাম ।

স্নানীলাদিদি বলল, সে কথা ঠিক বড় মাসীমা ! কিন্তু, কানীর কথা ভুলছ কেন ? তোমরা যদি সেই রাজিতে আমাদের আশ্রয় না দিতে, তা হ'লে আমি যে পথেই মারা যেতাম ।

বড় মাসীমা বললেন, ওরে পাগলী মেয়ে, আমরা বৃষ্টি তোমাকে

আশ্রয় দিয়েছিলাম ! এই বুঝি তোমার ধারণা ! তুলে গেলি মা, আর একজনের কথা ! কে আমাদের কাশী নিয়ে গিয়েছিল ? কে আমাদের সেই রাত্রিতে কাশীর পথে নিয়ে গিয়েছিল ? সে বাবা বিশ্বনাথ ! আমরা কে ? আর আজ যে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এক বৃদ্ধ সাহেব তোর জন্তে ছুটে এসেছেন, তাঁকে কে নিয়ে এসেছেন, জানিস্ মা ! তিনি ঐ বিশ্বেশ্বর !

আমার শাশুড়ী এতক্ষণে কথা বললেন ; তিনি বললেন, জান দিদি, তোমরা আমরা উপলক্ষ্য মাত্র । সুশীলার পুণ্যফলেই এমন সব সংযোগ হ'য়েছে । তবে, এ কথা বলতে পার, সুশীলা এত কষ্ট পেলে কেন ? এত ঘোর বিপদে সে পড়েছিল কেন ? তার কারণ আছে দিদি ! এক দিনের অবিবেচনার ও যে কাজ ক'রে বসেছিল, তার তো প্রায়শ্চিত্ত চাই ! সেই প্রায়শ্চিত্ত ওকে করতে হ'য়েছে । বাবা বিশ্বনাথ ওকে পুড়িয়ে একেবারে খাঁটি করে নিয়েছেন ।

সুশীলা তাড়াতাড়ি উঠে আমার শাশুড়ীর পায়ের ধূলা নিয়ে বলল, কাকীমা, তোমারই আশীর্ব্বাদে আমি আজ তোমার পায়ের গোড়ায় এসেছি । তুমি আর সতীশকাকা, আর মাসীমা, তিনকড়িমামা, কার কথা আমি আগে বলব । আমি তো সব ছেড়ে সব মায়ামমতা বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেই গিয়েছিলাম । ছুই বৎসর কি কম সাধনা করেছি ? দিনরাত্রি পথ ধুঁজেছি । কিন্তু, কৈ, কিছুই তো হোল না । তোমাদের রেহুপাশ তো ছিঁড়ে কেমনে পারলাম না । দেবতার মত আমি

অচলানন্দ, উদারহৃদয়, পরদুঃখকাতর এই স্বামী আত্মানন্দ—কেউ আমাকে বেধে রাখতে পারলেন না ! আমি ছুটে এলাম তোমাদের কাছে । আমি আর নিরানন্দ সইতে পারছি নে কাকীমা ! আমি চাই আমার চারিপাশে আনন্দের হাট বসাতে । আমি দেখতে চাই আনন্দময়ী মাকে ! তাই আমি এখানে এসেছি ! কিন্তু, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার সাধনার কোন ফলই হয় নি । আমি পথই দেখতে পাই নি । এখন তোমরা যদি আমার পথের সন্ধান দিতে পার, তা হ'লেই আমি বেঁচে যাই ।

তিনকড়ি বলল, পথ তো তোমাকে দেখিয়েই দিয়েছি ; তুমি যে সে পথে-যেতে চাও না । তোমাকে নিয়ে ভারি মুশ্কিলে পড়া গেছে সুশীলা ! আমি তো তোমার কথা বুঝতেই পারি নে । কি যে তুমি বল, কি যে তুমি চাও ।

সুশীলাদ্বিধা বলল, আমি কি চাই, জান তিনকড়িমা ! আমি বত শীগগির হয় মরতে চাই ; আর সেই মরণ আসবার যে কয়দিন বিলম্ব আছে, সে কয় দিন প্রাণ খুলে আনন্দ করতে চাই । তারই জন্ত আমি হরিষার ছেড়ে চ'লে এসেছি । সে আনন্দহীন স্বর্গভোগ আমার ভাল লাগল না । আমার এ কথার সাক্ষী ঐ যে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছেন ঐ আনন্দ !

আত্মানন্দ বললেন, আমাকে সাক্ষী মেনে কি হ'বে ? তোমার অদৃষ্টে আরও কি ভোগ আছে, তা ঐ বাগানবাড়ীতে বসে জানবুঝে জ্যোতিষী মহাশয় রাতের মধ্যে গণনা করে ঠিক করবেন । তিনি যা বলবেন, অর্থাৎ তিনি যা ভবিষ্যদ্বাণী

কল্পবেন, তুমি চাও আর না চাও, তোমাকে তাই কল্পতে হ'বে ; ভবিষ্যৎ তোমার জন্ম যা ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, তার অন্তথা তুমি কল্পতে পারবে না । তার মধ্যে আনন্দ থাকে, বেশ, সেই আনন্দকেই তোমাকে বরণ করে নিতে হ'বে ; আর তার মধ্যে যদি নিরানন্দ থাকে, আরও পরীক্ষার ব্যাপার থাকে, তোমার সাধ্য হ'বে না, তা এড়িয়ে যাও ।

আমি বললাম, অতএব, বৃথা বাক্যব্যয়ে কোন প্রয়োজন নেই ; এখন যার যেখানে আস্তানা হ'য়েছে, তিনি সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করুন । কাল সাহেবের কাছে যখন ভবিষ্যতের কথা জানতে পারা যাবে, তখন আজকের রাতটা চোখ বুঁজে কাটাতেই হ'বে ।

আমার কথা শুনে সকলেই য়ার য়ার শয়ন-স্থানে চলে গেলেন । তখন রাণী বলল, দেখ, রাত প্রায় বারোটা বাজে ; শব্দর তো তার মাসীমার কাছে আছে । এখন চল না একবার দেখে আসি ডাক্তারসাহেব কি করছেন । তিনি হয় তো এতরূণ জেগে নেই । যাই হোক, চল একবার দেখে আসি ।

আমি বললাম, আমার কোন আপত্তি নেই । কিন্তু বাগান-বাড়ীতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, ডাক্তারসাহেব এখনও জেগে আছেন, আর তাঁর অমূল্য পুঁথির মধ্যে নিবিষ্টচিত্ত আছেন, তা হ'লে কিন্তু নিঃশব্দে চলে আসতে হ'বে । তুমি যে তাঁর উপর এই রাত বারটার সময় চড়াও হ'বে, তা কিন্তু হলে না ।

রাণী বলল, তাই হ'বে, এখন চল ।

তখন আমরা দুইজনে নিঃশব্দে বাগানের দিকে গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম, বাগানের ঘরে আলো জ্বলছে, ছয়ার-জানলা এত শীতের মধ্যেও খোলা রয়েছে। আমরা বাগান থেকে আসবার সময় সব ছয়ার-জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসেছিলাম। তারপর সাহেব বোধ হয় খুলে দিয়েছেন।

আর বেশী দূর যেতে হ'ল না। বাগানবাড়ীর স্তম্ভে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় উঠতেই দেখি, ডাক্তারসাহেব রাস্তার মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আমরা কি করব ভাবছি, এমন সময় ডাক্তারসাহেব ফিরে দাঁড়ালেন এবং অনতিদূরে আমাদের দুই মূর্তি দেখে বললেন, কে গো তোমরা ?

তখন আর কি করা যায় ; আমরা দুইজনেই এগিয়ে গেলাম। ঘরের আলো এসে রাস্তায় পড়েছিল ; সেই আলোকে আমাদের চিনতে পেরে ডাক্তারসাহেব এগিয়ে এসে বললেন, এই দারুণ শীতের মধ্যে তোমরা বেড়াতে বেরিয়েছ। আশ্চর্য্য, ঠাণ্ডা লেগে অস্থখ করবে যে ?

রাণী হেসে বলল, রাত বারোটা যে শীতকালে বেড়াবার সময় নয়, তা জানি। আমরা দেখতে এসেছি, আমাদের বৃদ্ধ অতিথি এখন কি করছেন ?

সাহেব বললেন, যা দেখা-শোনা, পড়া, কোণ্ঠী মিলান, তা আমার শেষ হ'য়ে গেছে। বৃদ্ধা মাহুদ, একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, মাথাটাও একটু গরম হ'য়েছিল, তাই ছয়ার-জানলা খুলে দিয়ে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমাদের দেশের

এ শীত যতই বেশী হোক, বিলাতের সঙ্গে তুলনায় এ কিছুই নয়। দেখ, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তোমাদের নিয়ে একবার ইউরোপে যাই। আমাদের দেশটা দেখিয়ে আনি। যাবে রাণী, আমার সঙ্গে বিলেতে? যাবে হরেন্দ্র?

আমি বললাম, হঠাৎ এমন ইচ্ছা আপনার হলো কি ক'রে?

ডাক্তারসাহেব বললেন, তার কারণ আছে। আমি সুশীলার করকোণ্ঠী আলোচনা করে দেখলাম, তার শিক্ষালাভের জন্য বিদেশ-ভ্রমণ যোগ আছে। সে যোগের সঙ্গে আমার যে সংযোগ আছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। এই বাগানের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে আমি সেই কথাই মনে মনে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় তোমরা এসে পড়লে। সুমুখে তোমাদের দুইজনকে পেয়ে আমার মনে হলো, তোমাদের নিয়ে একবার বিলেত যাই না কেন; সুশীলাকে যে যেতেই হ'বে, তা তো গণনাতেই পেলাম। বেশ তো, চল না সবাই। হরেন্দ্র, তোমার তাতে লাভই হ'বে। তুমি যদি বিলাত থেকে একটা বড় রকম উপাধি নিয়ে আসতে পার, তা হ'লে তোমার পসার আরও বেড়ে যাবে; শিক্ষাও যে বেশী হ'বে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

রাণী বলল, আপনি কি গণে পেলেন যে, দ্বিদিনে বিলাত যেতেই হ'বে? কেন যেতে হ'বে, সেখানে গিয়ে দ্বিদিন কি করবে, কি শিক্ষা করবে, তা বলতে পারেন।

সাহেব বললেন, পারি বই কি! হিন্দু-জ্যোতিষ অনেক কথা বলতে পারে রাণী! শুনবে—সুশীলা কোনদিন সংসারধর্ম

করবে না, ঘর-গৃহস্থালীতে ওর মন বসবে না, এ আমি তার
 অল্পবয়স্ক সময়ই তার করকোষ্ঠী দেখে জানতে পেরেছিলাম ;
 তাই তখন তার ইচ্ছামত ব্যয়ের জন্ত তিনকড়ির হাতে পাঁচ
 হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে গেছিলাম। জান, সুনীলা
 কেন স্বামিজীর আশ্রম ছেড়ে এসেছে? আশ্রম ওর জন্ত নয়।
 আত্মানন্দের কাছে আমি বিকেলে শুনেছি, সুনীলা চায় আনন্দ!
 সাংসারিক আনন্দ নয়, ও চায় পরমানন্দ! সে আনন্দ ও
 কিসে পাবে, তা আমি বলতে পারি; আর্কটের সেবাতেই সুনীলা
 পরমানন্দ পাবে—আর কিছুতেই ওর প্রাণের আশা মিটবে না।
 সেই সেবাব্রতের উপযুক্ত করবার জন্ত ওর শিক্ষার দরকার।
 ওকে বিলাতে নিয়ে গিয়ে আমি ধাত্রী-বিদ্যা ও রোগিনীর
 সেবাপদ্ধতি শিখাবার ব্যবস্থা করব। আমি স্থির করেছি,
 সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রথম ছয় মাস ওকে আমার কাছে রেখে
 ইংরেজী ভাষা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে আমি বা সামান্য জানি,
 তা শিক্ষা দেব। তারপর ওকে খুব বড় একটা জ্বীলোকদের
 হাসপাতালে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে ধাত্রীবিদ্যা ও রোগিনী-পরিচর্যা-
 সম্বন্ধে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করব। সুনীলার যে রকম মেধা,
 তাতে দুই বছর আড়াই বছরের মধ্যেই ও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ
 করবে। এই সময় সুনীলার উপর একটা দুই গ্রহের প্রকোপ
 দেখতে পাওয়া যায়। সেটা যদি কেটে যায়—যাবে ব'লেই
 আমার মনে হ'য়—তবে আমি ঠিক বলতে পারছি নে। ঐটে
 কেটে গেলে ওকে আমি বাঙ্গলাদেশে, ওর প্রিয় জন্মভূমিতে

পাঠাব এবং আমার যা কিছু সঞ্চয় আছে, সব দিয়ে বাঙ্গলা দেশে মেয়েদের জন্ত একটা হাসপাতাল ক'রে দেব। সুশীলা সেই হাসপাতালের অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে যে আনন্দের জন্ত ও কাঙ্গালের মত ছুটে এসেছে, সেই অভুল আনন্দের অধিকারিণী হ'বে। তারই জন্ত এই বৃদ্ধ বয়সে ভগবান্ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন; এ কথা আমি বিশ্বাস করি। এ সেই বিশ্ব-বিধাতারই অভিপ্রায়! সেই জন্তই বলছিলাম, তোমরাও চল না আমার সঙ্গে। সংসারে আমার কেউ নেই। চাকরী ক'রে অনেক টাকা আমি জমিয়েছি, জীবনবীমা ক'রেও অনেক টাকা-আমি পেয়েছি। এত টাকা আমি কি করব, সেই কথা যখন-তখন ভাবতাম। ভগবান্ আমার সেই সঞ্চিত অর্থ সন্ধ্যা করবার পথ দেখিয়ে দিলেন। সুশীলার প্রতি যেমন আমার কর্তব্য আছে, তেমনই আমার অতি প্রিয়বন্ধু পরলোকগত সতীশের মেয়ে-জামাইয়ের প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যের অনুরোধেই হরেন্দ্র, তোমাকে বিলাত যেতে বলছি; আর তোমার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করবার জন্ত রাণী আর ভবশঙ্কর তোমার সঙ্গে যাবে। দেখ, আর এই শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেক না, ঘরে যাও। আমি তোমাদের দুই জনের কাছে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে নিশ্চিত হ'লাম; এখন আমি ঘরে গিয়ে অকাতরে নিদ্রা দিতে পারব। তোমরা যাও, আমি এখনই ঘুমিয়ে পড়ব। কাল সব কথা ঠিক হবে। এই বলে ডাক্তারসাহেব তাঁর শয়ন-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'লেন;

আমরাও যথারীতি তাঁর শুভ কামনা ক'রে ঘরে ফিরে এলাম।

পথের মধ্যেই রাণী বললে, আমাদের অনেক কথা ভাবতে হ'বে, কেমন ?

আমি বললাম, এত রাত্রে আর ভাবলে চলছে না। ঘরে গিয়ে ডাক্তারসাহেবের মত অকাতরে নিদ্রা দাও। কাল শ্রীমান্ ভবশঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমাদের কর্তব্য স্থির করা হ'বে।

রাণী বললে, সেই ভাল ; শঙ্করই শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা।



এপার

পরদিন প্রাতঃকালে আমাদেরই বৈঠকখানায় ডাক্তারসাহেব চায়ের মজলিস করলেন। তবে মজলিস বেশ জমল না, কারণ আমি আর রাণী ছাড়া বাড়ীতে চা-খোর কেউ ছিল না। তিনকড়িকে ডাকতে সে বলে উঠল, দোকানদার মাগুধ, অতি ক্ষুদ্র জীব। দু'বেলা যে দু'টো ভাতের সংস্থান করতে পারি, সেই আমার সৌভাগ্য। তার পরে আবার চা! ও বাবুগিরি লজ্জেক্স বেচনেওয়ালার পোষায় না; ও সব আপনাদের জন্ত, গরীব তিনকড়ি ও-রসে বঞ্চিত।

আস্থানন্দকে বলতে গেলাম, সে হেসে বলল, আজ চা খাই, কাল সিগারেট ধরি, তার পর দিন ব্যোম ভোলানাথ। তা হ'লেই আমার বেদান্তের বাপান্ত হ'য়ে যাবে। এই কয়েকদিনের সেবাতেই আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন স্থান ত্যাগেন দুর্জনঃ। এ সব মহাজনের সঙ্গে বাস করা আমার আর পুষ্টিয়ে উঠছে না। ডাক্তারবাবু! আমার ছুটি মঞ্জুর করুন; আমি আশ্রমে ফিরে যাই।

সুশীলা দিদি বললেন, আমার অদৃষ্ট লিপি পাঠ না করেই তুমি চ'লে যেতে পারবে আনন্দ!

আস্থানন্দ বললেন, তা পারছি নে বলেই তো আটকে পড়ে আছি। তোমার হাতে প'ড়ে আমার যে সাধন-ভজন মাধায় উঠবার যো হ'ল; তোমার নিত্যানন্দের বেগু সামলাতে

আত্মানন্দকে হাবুডুবু খেতে হ'বে। এখন ভাবছি, তোমার যা হয় একটা গতি স্থির হ'লেই আমি চ'লে যাই।

সুশীলা দিদি বললেন, চ'লে যেতে তুমি পারবে আনন্দ! তোমাকে কেউ আটক করতে পারবে না। কিন্তু, সত্য কথা বল তো আনন্দ, তুমি আশ্রমে গিয়ে নিশ্চিত মনে তোমার বেদান্তের আলোচনা করতে পারবে? আশ্রম-প্রান্তের আমার পর্ণকুটির, কুটিরের সম্মুখের নিম্ন গাছের ছায়! কি সুশীলার কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে না আনন্দ!

আত্মানন্দ বললেন, গুরুদেব সে কথা বলতে পারেন। আমি তাঁর আদেশ প্রতিপালন করেছি, এখন তাই করব।

ডাক্তারসাহেব বললেন, স্বামীজি, আমি বলি কি, আপনি আশ্রমে গিয়ে আপনার গুরুদেবের অহুমতি নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে বিলাতে চলুন না!

আত্মানন্দ হেসে বললেন, ডাক্তারসাহেব, 'আমাদের' শব্দটা বহুবচনে প্রয়োগ করতে হয়।

ডাক্তারসাহেব বললেন, আমি বহুবচনেই ও শব্দটা ব্যবহার করেছি।

সুশীলা-দিদি বললেন, কথাটা তো আমিও বুঝতে পারছি নে। আপনি কি শীঘ্রই বিলাতে ফিরে যাবেন? আপনি যে পত্র লিখেছিলেন, তার থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আপনি জীবনের অবশিষ্টকাল আমাদের সঙ্গেই কাটাবেন। এখন আবার 'আমাদের' এল কেমন করে?

ডাক্তারসাহেব বললেন, আমার সে সঙ্কল্প স্থিরই আছে ; আমি তোমার সঙ্গেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাব ; কিন্তু আপাততঃ তোমাকে নিয়ে আমি কিছুদিনের জন্য বিলাতে যাওয়া স্থির করেছি ।

সুশীলা-দিদি অবাক হ'য়ে বললেন, আমি যাব বিলেতে ! কেন, এত বড় ভারতবর্ষে কি অভাগীর জন্য একটু স্থান মিলবে না ! আর আমি বিলেতে কি করতে যাব ? এ যে অসম্ভব কথা !

এইবার রাগী কথা বলল, পৃথিবীতে অনেক অসম্ভব সম্ভব হ'য়ে থাকে । কাল রাত্রে ডাক্তারসাহেব আমাদের কাছে বলেছেন, তোমাকে বিলাতে যেতেই হ'বে । সেখানে গিয়ে ধাত্রীবিদ্যা শিখে এসে বঙ্গলা দেশে গিয়ে তুমি হাজার হাজার দরিদ্রা রোগিনীর জগদ্ধাত্রী হ'য়ে আনন্দের হাট বসাবে, এই তোমার অদৃষ্টলিপি দিদি !

সুশীলা-দিদি এই কথা শুনে চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগলেন । একটু পরেই বললেন, এই কি আমার পথ ! আপনি কি আমার জন্য এই পথই নির্দেশ করছেন । আমি কিন্তু অন্ধকার দেখছি । কৈ, আলোর তো সন্ধান পেলাম না । বড় কাকীমা, কাকীমা, রাগী, জামাইবাবু, আলো কৈ ? তিনকড়িমামা, আনন্দ, আমার মনের অন্ধকার দূর ক'রে দাও তো ! ডাক্তার সাহেব এই কি আপনার আদেশ ? বলুন, এই কি অভাগীর পথ ? এই ব'লে সুশীলা-দিদি আবার চোখ বুঁজলেন । আমরা অবাক হ'য়ে ঠাঁর দিকে চেয়ে রইলাম । আমার মনে হ'তে লাগল দিদি অন্ধকারের মধ্যে আলোর অন্বেষণ করছেন ।

প্রায় পাঁচ মিনিট এই ভাবে কেটে গেল ; আমরা দিদির মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকলাম । তারপর তিনি সেই মুদিত-নেত্রে থেকেই কি যেন বললেন ; সে কথা এমন অস্পষ্ট যে আমরা কেউই তা বুঝতে পারলাম না । ডাক্তার-সাহেবের দিকে চেয়ে দেখলাম, তিনি স্নগীলা-দিদির মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রয়েছেন । এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার !

একটু পরেই স্নগীলা-দিদি ধীর গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠলেন—
তমসো মা জ্যোতির্গময় !

এই বয়সে কম দেখি নি, অল্প-বিস্তর পড়াশুনাও যে না করেছি; তা নয় ! কিন্তু, স্বীকার করছি এমন দৃশ্য কখন দেখি নি, কখন পড়ি নি,—ঘোর অন্ধকার-সাগরে পড়ে আলোর জ্বল এমন কাতর নিবেদন, প্রাণের গভীরতম প্রদেশ থেকে উখিত এমন আকুল প্রার্থনা আমি কখনও শুনি নি । আমি একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম । শুধু আমি নই, সেখানে যে যে উপস্থিত ছিলেন, সকলের হৃদয়েই এক অপার্থিব প্লাবন এসে উপস্থিত হ'য়েছিল । মনে হ'ল, সকলেই যেন তারস্বরে বলছেন—আলো, আলো—কোথায় আলো !

কতক্ষণ এ ভাবে কেটেছিল, বলতে পারি নে ; অকস্মাৎ রাণীর স্নমধুর কণ্ঠস্বরে সকলের চেতনা সঞ্চার হ'ল । রাণী গেয়ে উঠল—

“ও যে দেখা যায় আনন্দধাম

অপূর্ব শোভন,

ভব-জলধির পারে জ্যোতির্দয় !”

এ কি আশ্বাসের বাণী ! কি প্রাণস্পর্শী সাধনা ! সবারই দৃষ্টি উর্ক দিকে গেল ; সকলেই উৎসুকভাবে কি যেন প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন ।

রাণী আবেগ-কল্পিত স্বরে যখন আবার গায়িল

ঐ যে দেখা যায়—

তখন সুলীলা-দিদি আর স্থির থাকতে পারলেন না ; যে অন্ধকার-সমুদ্রে তিনি কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না, সেইখানে বোধ হয় আবার আশ্বাস ধ্বনিত হলো ; তিনি ব'লে উঠলেন, কৈ, কৈ, কোথায় আলো ।

রাণী তেমনই উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, ঐ যে দেখা যায় !

হায় অন্ধ মানব ! আমরা যে কিছুই দেখতে পেলাম না । যিনি আলোর অন্ত হৃদয়ভেদী চীৎকার করছিলেন, তিনিও দেখতে পেলেন না ;—তিনিও বলতে লাগলেন কৈ, আলো কৈ ?

আলোর দর্শন মিলল না ! ধীরে ধীরে গভীর নিস্তরুতায় সমস্ত ঘর ছেয়ে গেল ।

সেই নিস্তরুতা ভঙ্গ করলেন ডাক্তারসাহেব । তিনি বললেন, এই আলোর অন্ত ব্যাকুলতাই আনন্দলোকের, জ্যোতির্শ্ময় ধামের পথ-প্রদর্শক । এখন এই অন্ধকারেই উপাসনা করতে হ'বে । জানি না কি হ'বে ; কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, সুলীলাকে আমার সঙ্গে যেতে হ'বে । আমি যে পথ নির্দেশ করেছি, এখন সুলীলার অন্ত সেই একমাত্র পথ । আর পথের সন্ধান আমি পাই নি ।

সুশীলা-দিদির তখন জ্ঞান সঞ্চার হ'য়েছে ; তিনি ডাক্তার-সাহেবের দিকে ফিরে করযোড়ে বললেন, তাই হ'বে ! আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাব ; যা করতে বলবেন, তাই করব ।

ডাক্তারসাহেব সুশীলা-দিদির মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, হে ভগবান !



বার

গুটা দুই রোগী দেখবার জন্ত আমাকে সেদিন বিকেলে বেরতে হ'য়েছিল। বাড়ীতে যখন ফিরলাম, তখন দেখি উপরে আমার শোবার ঘরে সবাই একত্র হ'য়েছেন। ডাক্তারসাহেব একখানি ইঞ্জি চেয়ারে অর্ধ-শয়ান অবস্থায় রয়েছেন; আত্মানন্দ স্বামী একখানা কার্পেটের আসনে উপবিষ্ট; তিনকড়ি আমার বিছানায় শুয়ে পা নাচাচ্ছে; আর সবাই যে যেখানে পেরেছেন বসে আছেন।

এতক্ষণ বোধ হয় স্নান-দিদির সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল। আমি যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তখন রাণী বলছে, শোন মাসীমা, অনেকদিন আগে, সে বোধ হয় দশ বারো বছর হ'বে, একবার পূজার সময় না আর বাবার সঙ্গে আমি আমাদের দেশে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন এক ভিথিরী মুখে একটা গান শুনেছিলাম। এতকাল পরে, আজ বারে বারেই সেই গানটা আমার মনে হচ্ছে। সবটা মনে নেই, গোড়াটুকু মনে আছে। ভিথিরী গেয়েছিল—

“তুই ষাণি মা বাপের বাড়ী,

আমার কেন মন সরে না।

এমনি মনে হচ্ছে আমার,

গেলে দেখা আর হ'বে না।”

বল তো মাসীমা, এত গান থাকতে এইটেই আমার মনে আসছে কেন ?

কেন যে মনে আসছে, তা তিনজন বলতে পারেন। এক পারেন ডাক্তারসাহেব, আর পারে রাগী, আর পারি আমি। আগের দিন রাত দুপুরে বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাক্তারসাহেব সুলীলা-দিদির যে রিষ্টির কথা বলেছিলেন, সে কথা তো আমরা কারও কাছে বলি নি ; ডাক্তারসাহেব নিবেদন করে দিয়েছিলেন। রাগীর মনে সেই কথাই জাগছিল। তাই সে কতদিন আগের শোনা ঐ গানটা দিয়ে তার আশঙ্কার কথা প্রকাশ করল। কথাটা আমরা তিনজনই বুঝতে পারলাম।

রাগীর কথা শুনে আমার শাশুড়ী বললেন, কোথায় সেই সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে সুলীলা চলে যাবে, কতদিন দেখা হবে না ; তাই তোমার মন অমন করছে রাগী ! • কেউ কোথাও যাবে শুনলে ঐ ভাব অনেকেরই মনে হয়।

বড় মাসীমা বললেন, ঐ কথাটা শুনে অবধি আমারই প্রাণ কেমন করছে ; রাগী তো ছেলেমানুষ। আচ্ছা সুলীলা, তুমি সেই কোন্ মুহূর্ত বিলেতে যেতে পারবে, এই সব ছেড়ে। তোমার মন কি এখানকার জন্ত একটুও কাতর হবে না মা ?

তিনকড়ি শুয়েছিল, লাফিয়ে উঠে বলল, কিচ্ছু হবে না। ও মেয়েটার কি দয়া-মায়্যা বলে কিছু আছে। ও অভাগী একেবারেই পাষাণী। জ্ঞান না বড়-দিদি, আশ্রম থেকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্ত কম চেষ্টা করেছিলাম। বেটী কি কোন কথায় কাণ দিল।

ও মেয়েটা মেয়েই নয়, ওর মধ্যে যে কি আছে, তা এতদিনেও বুঝতে পারলাম না। ও যেন কিছুই গায়ে মাখে না। ঐ যে স্বামীজী বসে আছেন, উনি একদিন একটা সংস্কৃত শ্লোক বলেছিলেন; খাজা মূর্খ মাহুম, লেখাপড়া তো জানি নে, সে শ্লোকটা মনে নেই; কিন্তু তার অর্থটা মনে আছে; অর্থাৎ যাতে লাগিয়ে দিচ্ছ ভগবান্, তাই করছি। বলুন না স্বামীজি, সে শ্লোকটা কি? দু'টো একটা ঐ রকম শ্লোক শিখে রাখা ভাল। তেমন তেমন ধন্দের দোকানে এলে ঐ রকম দুই একটা শ্লোক কাড়লে চার আনার জিনিস দশ আনার বেচতে পারব—একেবারে ডবল লাভ।

আত্মানন্দ স্বামী সহাস্ত্র মুখে বললেন,

“তয়া-হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন

বথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।”

তিনকড়ি বলল, মেয়েটা ঐ ‘তথা করোমি’র দলে। ওর কি বাপ-মা, ভাই-বন্ধুর উপর এক তিলও দরদ আছে?

সুশীলা-দিদি বলে উঠলেন, আর কারও উপর দরদ না থাকুক, তোমার উপর আছে তিনকড়িমামা!

তিনকড়ি বিছানা থেকে নেমে আমার কাছে এসে বলল, শুনছেন জামাইবাবু, বেটীর কথা। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। ও কি আমাদের কম হায়রাণ করেছে এই কয় বৎসর। এখন আদর ক’রে বলা হচ্ছে তিনকড়িমামা! জানেন জাম্বাইবাবু, এই কয় বছরে সেই কবুলেটোলা থেকে আরম্ভ ক’রে কোথায় গয়া-

কাশী, মথুরা-বৃন্দাবন, সাজাহানপুর, হরিদ্বার, অবশেষে এই কানপুর; বেটা আমাদের এই ভাই-বোন ছ'টাকে সারকাসের ঘোড়ার মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কষ্ট কি কম দিয়েছে। জানেন জামাইবাবু, ঐ বেটা যেদিন কনুলোটোলা থেকে ভূতের মত কোঁথায় অন্তর্দ্বান করল, সেদিন থেকে তিন চারদিন এই তিনকড়ি সারাদিন না খেয়ে, সারারাত না ঘুমিয়ে কলকাতা শহর, একদিকে বরানগর কাশীপুর, আর একদিকে বেহালা-টালীগঞ্জ পাগলের মত ওকে খুঁজে বেড়িয়েছিল। দিনরাত ঐ বেটার জন্ত পথে-পথে কেঁদে ফিরেছি। তার পরের কথা আর নাই বললাম। বেটা কি সে কথা ভাবে? এখন বলছে তিনকড়ি আমার উপর দরদ আছে। যাঃ, যাঃ, বেটা—ঐ যে গান আছে—

ঢের ভালো করেছি স্ত্রীমা

আর ভালোতে কাজ নাই।

এখন, ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দে মা!

আলোয় আলোয় চ'লে যাই ॥

ডাক্তারসাহেব এতক্ষণ চুপ করে এই সব কথা শুনছিলেন। তিনকড়ি যখন বলল, আলোয় আলোয় চ'লে যাই, তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, উঠে এসে তিনকড়িকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, আলোয় আলোয় কোথা যাবে তিনকড়ি? তোমাকে যে আলো ধরতে হ'বে।

তিনকড়ি অবনত মস্তকে বলল, তা আর হলো কৈ ডাক্তার-

সাহেব? আমার মত অপদার্থের হাতে ভার দিয়ে আপনি চ'লে গেলেন বিলাতে। আমি কি ঐ মেয়ের ভার নিতে পারি? আমি পারি চিৎপুর রোডের দোকানে বসে সিগারেট বেচে দেশের ছেলেদের উৎসন্ন দিতে। কিন্তু, তাও যে ঐ স্ত্রীলোকের জন্ত পেরে উঠিনে। এক এক সময় নিজের উপর রাগ হয় ডাক্তারসাহেব। বলি, ও আমার কে যে, ওর জন্ত ভেবে মরি। ওর সঙ্গে আমার তো কোন সম্বন্ধই নেই। কবে কিছুদিন আমার ভগিনীপতির বাড়ীর ওরা ভাড়াটে ছিল; সেই সময় একটু পরিচয় হ'য়েছিল। সেই সম্পর্কে এই কয় বছর ঐ মেয়েটা আমাকে আর আমার ঐ দিদিকে কি একদণ্ডের জন্ত স্থির থাকতে দিয়েছে। এখন ও-পাপ বিদেয় হ'লেই বাঁচি। নিয়ে যান ওকে সাত স্ত্রীদুরের পারে। এ তো আর হরিদ্বারও নয়, সাহাজানপুরও নয়, কানপুরও নয় যে, এক পয়সার একখানা পোষ্ট-কার্ড লিখলেই সব কাজ ফেলে ছুটে আসি।' যা স্ত্রীলোক, তাকে এবার দীপান্তরে পাঠিয়ে এই তিনকড়ি মিত্র দিন কয়েক হাত-পা মেলে বিশ্রাম করুক। জানেন জামাইবাবু, আমি যে দোকান করি, সে কার জন্ত। দিদির যা আছে, তাতে উনি যে কয়দিন বাঁচবেন, কোন অভাব হ'বে না। আমার আর কি? তবুও যে দোকান করি, টাকা জমাই, সে ঐ মেয়েটার জন্ত। ও যে হরিদ্বারের আশ্রমে বেশীদিন থাকবে না, তা আমি জান্তাম। ওখান থেকে চলে এলে ওর ভার আর কে নেবে এই তিনকড়ি ছাড়া। তাই এই দোকান করতে হ'য়েছিল। এখন বাঁচা গেল; ডাক্তারসাহেব ওর ভার নিলেন,

আমার কাজ শেষ হ'ল। এইবার দিদিকে কাশীতে রেখে দিয়ে কলকাতায় যাব। দোকান-পাট বেচে ফেলে, না হয় কাউকে দান ক'রে একেবারে হিমালয়!

সুশীলা-দিদি তিনকড়ির কথা শুনছিলেন, আর আঁচলে চোখ মুছছিলেন। তিনকড়ির কথা যখন শেষ হলো, তখন বললেন, তিনকড়িমামা, তুমি যে আমার কে, তোমরা ভাই-বোনে যে আমার জন্ত কি ক'রেছ, তা কি আমি ভুলতে পারি? আমার জন্ত যে তুমি গৃহী হ'য়েও সন্ন্যাসী, তা আমি জানি; কিন্তু, কি করব বল। আমি যে কি চাই, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। একদিন ঐ আত্মানন্দ স্বামীকে সে কথা বলবার চেষ্টামাত্র ক'রেছিলাম। দেখ মামা, এই অভাগীর কথা তোমরা ভুলে যাও। আর আমি তোমাদের বিরক্ত করতে আসব না। ঐ যে বৃদ্ধ দেখছ; আমার অবলম্বন এখন উনিই হ'বেন। আমি যা চাই, উনি তাই আমাকে দিতে পারবেন, এই বিশ্বাসেই আমি ঠুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছি। সত্যিই তো, আমি তোমাদের কে?

তিনকড়ি আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। যে তিনকড়ি দিনরাত হেসে-খেলে আমোদ-আনন্দে কাটাতে অভ্যস্ত, সুশীলার কথা শুনে সেই তিনকড়ি একেবারে বালকের মত কাঁদতে লাগল। অনেক চেষ্টায় সেই কান্না সংবরণ করে বলল, সুশীলা, তুই যে আমার কে, সে কথা কেমন ক'রে তোকে বোঝাব। তুই যদি অমন ক'রে কষুলেটোলা থেকে না চলে যেতিস, তা হ'লে যে

বাগবাঝারের গুণ্ডা তিনকড়ি ছিল, তাই থাক্ত। কিন্তু, তুই তা থাকতে দিলি কৈ মা ?

ডাক্তারসাহেব বললেন, দেখ তিনকড়ি, আমি একটা কথা বলি। সুলীলাকে বিলাতে নিয়ে যাব শুনে তোমার মন কেমন ক'রছে। তা করবারই কথা। ওর মানেই, বাপ থেকেও নেই। ওর মুখের দিকে চাইবার লোক তুমি, আর তোমার দ্বিদি, আর ঐ সতীশের স্ত্রী। আমি বলি কি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না।

তিনকড়ি একেবারে লাফিয়ে উঠল, আমি? আমি যাব বিলেতে? আপনি বুড়ো বয়সে পাগল হ'লেন না কি? আমি সেখানে গিয়ে কি করব। আমার বিছা সেই ফিগু ক্লাস অবধি। কোন রকমে ইংরেজীতে নামটা সই করতে পারি, আর 'ইয়েস', 'নো' বলতে পারি। আমি গিয়ে কি করব? সুলীলা না হয় ডাক্তারী শিখে এসে দেশের কাজ করবে। আমি কি শিখব। সিগারেট আর লঞ্জেঞ্জুজ বেচবার যে বিছা, তা আমার আছে। কিন্তু, ও কাজও আমি ছেড়ে দেব। আপনারাও চলে যাবেন, আমিও দোকান-পাট তুলে দিয়ে কি করব জানেন? হরিষারের ঐ আশ্রমে গিয়ে, মা সুলীলা যে কুটীরে ছিল, সেই কুটীর দখল ক'রে বসব। ও যেখানে বসত, সেইখানে ব'সে থাকব। আর আমার স্থান নেই। আশ্রমের সেই কুটীরের সম্মুখের গাছতলায় বসে ওরই নাম জপ করব। ডাক্তারসাহেব, ও কি সুখ সুলীলা? ও আমার মা—আমার জগন্মাতা। ও যেখানে থাকুক না কেন,

আমি ওকে দেখতে পাব। যাক না বেটা স্বীপাস্তুরে। তাক্ত কি আর মনাস্তর হ'বে। এই আমার কথা। ঐতক্ষণ পাগলের মত যা মুখে এল, তাই বললাম। এইবার আসল কথা বলে কেলেচি। আপনারা এখন যত শীগুগির পারেন, যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন। আপনাদের বিদায় না করে দিদিও নড়বেন না, আমিও যাব না; এই রাণীমার অন্ন ধ্বংস করব।

রাণী বলল, আমার অন্ন তো ধ্বংস হ'বে না; মায় সুদ জমা হ'বে। একবার কলকাতায় গিয়ে সুদে-আসলে আদায় ক'রে আসব।

ডাক্তারমাহেব বললেন, কবে যে যাত্রা করতে পারব, তা ঠিক বলতে পারছি নে। আর যে এদেশে আসতে পারব, তা মনে হয় না। এবার যখন এসেছি, তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শেখ দেখা করে যেতে চাই। একবার সিমলায় যেতে হ'বে। লাহোরেও যেতে হ'বে; কলিকাতায় একবার না গেলেই চলেবে না। তারপর জিনিসপত্র গোছাতে হ'বে। বিলাতের কথা ভাবি নে, এই মেলেই আমি চিঠি লিখে দিলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সেখানে গিয়ে যাকে সুশীলার শিক্ষয়িত্রী ও সঙ্গিনী ক'রে দেব, তাও মনে মনে ঠিক করছি। এই মেলেই তাকে পত্র দেব। সে প্রায় ত্রিশ বছর কলকাতায় ছিল। বাঙ্গলা যা জানে, সুশীলাও তত জানে না। সে এ দেশে জেনানা-মিশনে ছিল। সব দিক দিয়েই সে উপযুক্ত। সুশীলার কোন কষ্ট হ'বে না। আমি মনে করছি, কালই আমি বেঝিয়ে পড়ি। দশ বারো দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। এক সিমলাতেই ছ'তিন দিন বিলম্ব হ'তে পারে।

আমি সেখানে থেকেই 'প্যাসেজ এনুগেজ' করব। তারপর ফিরে এসেই বরাবর বোম্বে গিয়ে জাহাজ ধরব। হরেন্দ্র, আমি যখন তোমাকে পত্র দেব, তখন তুমি রাণীকে সঙ্গে নিয়ে বিলাতে যাবে। তোমাকে সেখানে অনেক দিন থাকতে হ'বে না, এখানকার এমন বাধা প্র্যাক্টিস্ ছেড়ে অনেকদিন বাইরে থাকাও ঠিক হ'বে না। সুশীলার শিক্ষা যখন শেষ হ'য়েছে মনে করব, তখনই তোমরা যেও। তারপর সবাই এক সঙ্গে এস। তবে' ততদিন আমি বাঁচব কি না বলতে পারি নে। যদি বেঁচে থাকি, তা হ'লে আমিও তোমাদের সঙ্গে এসে সুশীলার কার্যক্ষেত্র ঠিক ক'রে দিয়ে যাব। চাই কি, জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন এ দেশেই কাটিয়ে দেব। এবারও আসবার সময় ঐ কথাই ভেবেছিলাম; কিন্তু, কার্যতঃ তা হ'য়ে উঠল না। বাঁচি আর মরি, আমি যা করবার, তার ব্যবস্থা বিলাতে গিয়েই করব, বিলম্ব করব না। যে উইলখানা করেছিলাম, তা একেবারে রদ করে, আর একখানা নতুন উইল করতে হ'বে। আমি আর একটা ডুপ্লিকেট রেজেষ্ট্রি ক'রে তোমাকে পাঠাব হরেন্দ্র। আমি সেবার যখন ছুটি নিয়ে বিলাত যাই, তখন সতীশের উপর কোন ভারই দিই নি, কারণ আমি বেশ জানুতে পেরেছিলাম, পৃথিবীতে তার কাজ শেষ হ'তে বিলম্ব নেই। এবার তোমার ও তিনকড়ির ওপরই এ দেশের কাজের সম্বন্ধে আমি বেশী নির্ভর করব। তিনকড়ি যা এতক্ষণ বলল, সে সব বাজে কথা। ও শীঘ্র অব্যাহতি পাচ্ছে না। তবে, সবই ভগবানের হাত হরেন্দ্রনাথ!



ভের

পরের দিনই ডাক্তারসাহেব সিমলা চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, তিনি সিমলা থেকে লাহোরে যাবেন, সেখান থেকে সোজা কলকাতায় যাবেন, পথে একবেলার জন্ত এলাহাবাদেও নামতে পারেন। সুশীলাদিদির জন্ত কি কি দরকার হ'বে, তার দুইটা ফর্দ করলেন; একটা তিনি নিলেন, কলকাতা থেকে সেগুলি কিনে আনবেন; আর একটা ফর্দ আমাকে দিয়ে বললেন, হরেন্দ্র, এ সব তুমি গুছিয়ে রেখ। আমি এসে যেন সমস্ত রেডি পাই—এই বলেই তিনি কয়েকখানি নোট আমাকে দিতে এলেন।

আমি বললাম, আপনার আশীর্বাদে এই সামান্য কয়টা টাকা আমি দিদির জন্ত খরচ করতে পারব।

তিনকড়ি বলল, সাহেব, আমার স্বন্ধে যে পাঁচ হাজার টাকা চাপিয়ে রেখেছেন, তার কি হ'বে? আমি আজই একবার কলকাতায় যাব। হঠাৎ চলে এসেছি, কাজ-কর্মের কোন ব্যবস্থাই করে আসি নি। সেগুলো ঠিক করে চারপাঁচ দিনের মধ্যেই আমি এখানে আসব। আপনি অহুমতি করুন আর নাই করুন, আমি ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে নিয়ে আসব, তারপর যা করতে হয় আপনি করবেন।

ডাক্তারসাহেব বললেন, না তিনকড়ি, টাকা তুলে আনবার দরকার নেই। টাকু তো তোমায় দিই নি, সুশীলার জন্ত খরচ

করবার অধিকারই তোমাকে দিয়েছি। সে খরচের যখন আপাততঃ দরকার হচ্ছে না, তখন থাক না টাকাটা ব্যাঙ্কে মজুদ। তাতে তোমার কি ভার বোধ হচ্ছে। এখন থাক; পরে যা হয় দেখা যাবে।

তিনকড়ি বলল, বেশ, তাই হ'বে।

ডাক্তারসাহেব প্রাতঃকালের গাড়ীতে সিমলায় চলে গেলেন; তিনকড়ি রাত্রের গাড়ীতেই কলকাতায় যাত্রা করল। বড়মাসীমা কানপুরেই থাকলেন; সুশীলা-দ্বিদিকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে তারপর যা হয় করবেন। আশ্বানন্দস্বামীও সেই দিন হরিদ্বারে চলে গেলেন; বলে গেলেন, সুশীলারা যেদিন কানপুরে থেকে যাত্রা করবে, দিন দুই আগে সে সংবাদ পেলে তিনি স্বামীজির অমুমতি নিয়ে একবার তাকে শেষ দেখতে আসবেন, হয় তো সুবিধা হ'লে বোম্বাই পর্য্যন্তও যেতে পারেন। আমি আর রাণী ভবশঙ্করকে নিয়ে বে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাব, সে আমরা ঠিক ক'রেই রেখেছিলাম।

আমি মনে করেছিলাম, বিলাত যাওয়ার এই ব্যবস্থায় সুশীলা-দ্বিদি হয় তো বিমর্ষ হ'বেন। তার কোন লক্ষণই দেখলাম না। তিনি তেমনই হেসে খেলে গৃহস্থালীর কাজ করতে লাগলেন, আর দণ্ডে দশবার শঙ্করকে কোলে নিয়ে কি আনন্দ!

মাসীমা একদিন বললেন, ওরে সুশীলা, ছেলেটাকে যে এমন ক'রে গলার হার কল্পি, আর ক'দিন পরেই যখন ছেড়ে যেতে হ'বে, তখন কি করবি। কেঁদে মরবি যে!

সুশীলা-দ্বিদি বললেন, কেন, ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

সেখানে ওকে লেখাপড়া শেখাব। তারপর ও হাকিম হ'য়ে আসবে। এখানে থাকলে তো শিখবে 'রাম রাম, বাবুসাহেব!' বড় জোর না হয় কাপড়ের কলের কেরাগী হ'বে, আর না হয় বটতলার উকিল হ'বে। খুব যদি সৌভাগ্য হয়, তা হ'লে দীনবন্ধু মিত্রের ঘটীরাম ডিপুটী হ'বে। ওকে আমি সাহেব করব।

আমি হেসে বললাম, মানুষ খুন-করা হকিমের ছেলের অত আশা করতে নেই। আগে দেখি, ওর মাসীমা কেমন মেমসাহের হ'য়ে আসেন, তারপর বোন-পো'র কি করা বাবে, তা ঠিক হ'বে।

সুশীলা-দ্বিদি বললেন, মেমসাহেব! সে আমি কখনোই হ'ব না। এই যে শাড়ী দেখছেন জামাইবাবু, এ আমি ছাড়ব না কোন দিন। এখন যেমন বাক্সালী আছি, তার থেকে বেশী বাক্সালী হ'ব। বিলাতে খুব শীত বলছেন? সে শীত আমি মোটা কাপড়ের সহিতে পারব। এই যে ছ' বছর হরিষারে ছিলাম, কই, শীতকালেও আমার শীত বোধ হয় নি। সেখানে না হয় এঁর চারগুণ শীত হ'বে; আমি কখন গায়ে জড়িয়েই চালিয়ে মিতে পারব।

আমি বললাম, বাইরে বেরুবার সময় গরম জামা, গরম মোজা ব্যবহার করতেই হ'বে। নইলে একদিনেই নিউমোনিয়া। তখন ডাক্তারসাহেবের বাবারও সাধ্য হ'বে না যে রক্ষা করেন।

সুশীলা-দ্বিদি বললেন, তিনি রক্ষা না করলেই আমি রক্ষা পাই। এখানেও গঙ্গা, সেখানেও গঙ্গা! এখানে না হয় নাম হয়েছে ভাঙ্গীরখী; সেখানে নাম হয়েছে তমসা। ও একই কথা। সেখানে মরতে আমার কোন আপত্তি নেই। ও—খাবার কথা

বলছেন* আপনি। আপনি মনে ক'রেছেন, বিলাত গিয়ে আমি
 ঝুটি, বিস্কুট, মুরগী, গোরু, শুয়ার, ঘোড়া খাব। সে হ'বে না বন্ধু!
 সেই হরিদ্বারে গিয়ে যে অন্নত্যাগ করেছি, ফলমূল ধরেছি, জীবনের
 শেষদিন পর্যন্ত তাই আমার থাকবে। যদি এ দেশে থাকতাম, তা
 হ'লেও ঐ আমার আহার হ'তো, বিলাতে এমন কি স্বর্গে গেলোও
 তাই আমার আহার হ'বে! এই তো এখানে কয়দিন এসেছি;
 মাসীমা, কাকীমা, কত বলেছেন। আসি তাঁদের আদেশ অমান্য
 করেছি। হরিদ্বারে আচার্য্য অচলানন্দের পায়ে তলায় বসে
 আর কিছুই শিখতে পারি নি, শিখেছি 'আত্মসংযম'। এই বর্ষে
 আবৃত্ত হ'য়েই আমি নিরাপদে আমার জীবন কাটাতে পারব, কোন
 প্রলোভন আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

রাণী বলল, আচ্ছা দিদি, তুমি যখন এম-ডি ডাক্তার হ'য়ে
 আসবে, তখন তোমার নাম কি হ'বে?

সুশীলা-দিদি বললেন, তুই বল না কি নাম হ'বে।

রাণী বলল, তোমার নাম হ'বে ডক্টর মিসেস সুশীলা মিত্র
 এম-ডি।

সুশীলা-দিদি বললেন, কিছুতেই না। ও সব 'ডক্টর' 'এম-ডি'
 কিছুই আমার নামে থাকবে না। আমার নাম এখনও যা, লাট-
 সাহেব হ'লেও তাই থাকবে—আমার নাম সুশীলা চট্টোপাধ্যায়।

আমি বললাম, সে কি রকম; আপনি তো দিদি কায়স্থের
 মেয়ে, কায়স্থের স্ত্রী। আপনার নামের সঙ্গে আমাদের, ব্রাহ্মণের
 চট্টোপাধ্যায় কেন?

সুশীলা-দিদি বললেন, আমি কায়স্থের মেয়ে নই। যেদিন কলকাতার কল্লেটোলা থেকে বে'র হ'য়েছিলাম, সেই দিন থেকে আমার জাত গিয়েছিল। আমার মা কি বলেছিলেন মনে নেই। তিনি বলেছিলেন 'আমার কোন মেয়ে হয় নি, সুশীলা নামে আমার কেউ নেই।' সে কথা, সে সতীলক্ষ্মীর কথা কি আমি ভুলেছি? সেইদিন থেকে আমি কায়স্থের মেয়ে নই। তার পর যে-দিন মৃতপ্রায় অবস্থায় আমি সাজাহানপুরে গিয়েছিলাম, সেদিন কেউ আমাকে আহ্বান করে নি. ঐ আমার স্বর্গীয় কাকাবাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন; বলেছিলেন, তোর আর কেউ না থাকে আমি আছি। সে কথা আমি ভুলি নি রাণী! সেইদিন থেকে আমি চট্টোপাধ্যায়—আমি সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। তারপর, আর একটা কথা আছে রাণী! তোর ঐ মিসেস্ কথাটায় আমার ঘোর আপত্তি। আমি কুমারী ব'লে নিজের পরিচয় দিতে পারব না; কিন্তু আমি যে বিধবা, এ কথাও আমি কোন দিন স্বীকার করব না। আমি যে বিবাহিতা, তাও আমি স্বীকার করব না। আমি ও-সব কিছুই নই। আমার অল্প কোন পরিচয় নেই। আমার পিতৃকুল নেই, মাতৃকুল নেই, স্বশুর কুলও মোটেই নেই। আমার জীবন আরম্ভ হ'য়েছে সাজাহানপুরে; আমার নাম তাই সুশীলা চট্টোপাধ্যায়, আর কিছু নয়।

এই অপূর্ব কথা শুনে আমার শাশুড়ী উঠে এসে সুশীলা-দিদিকে বুক্কে জড়িয়ে ধরে বললেন, সেই ঠিক মা, তোর কথাই ঠিক। তুই আমার বড় মেয়ে, রাণী আমার ছোট মেয়ে। .তোর

মত মেয়ে পেরে আমি ধস্ত। আর যিনি স্বর্গে ব'সে তোর এই
অমৃতময়ী কথা শুনছেন তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে মা আমার !

* * * *

তের দিন পরে ডাক্তারসাহেব কানপুরে ফিরে এলেন,; বল্লেন,
তিন দিন পরে বোধে থেকে যে জাহাজ ছাড়বে, তাইতে তাঁদের
প্যাসেজ বুক হ'য়েছে। ইতিমধ্যে তিনকড়িও এসে গিয়েছে।

যে-দিন ডাক্তারসাহেব এলেন, সেইদিনই রাত্রির মেলে যাত্রা না
করলে তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে বসেতে জাহাজ ধরতে পারা যাবে না।

তখন তাড়াতাড়ি যাত্রার আয়োজন করা হ'ল। ডাক্তার
সাহেব আমার উপর যে সকল জিনিস কেন্‌বার ভার দিয়েছিলেন,
আমি সে সব কিনে রেখেছিলাম। তিনি কলকাতায় যা কিছু
কিনেছিলেন, সে সব সেখান থেকেই বসে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি, রাগী, ভবশঙ্কর আর তিনকড়ি বসে পর্য্যন্ত যাব স্থির
হলো। আন্যানন্দকে তার করে দিলাম; তাঁর আর আসবার
সময় হলো না। বিকেল বেলাতেই স্বামী অচলানন্দের তার
পেলাম; তিনি সুশীলা-দিদিকে সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করেছেন।

সুশীলা-দিদি সকলের পায়ের ধূলা নিয়ে যাত্রা করলেন। তৃতীয়
দিন প্রাতঃকালে বসে পৌঁছেই আমরা ডাক্তারসাহেব ও সুশীলা-
দিদিকে জাহাজে তুলে দিলাম। বেলা সাড়ে আটটার সময়
জাহাজ বসে ত্যাগ করল। রাগী চোখের জল ফেলতে লাগল,
শঙ্কর মাসীমার নাম ধ'রে চীৎকার করতে লাগল। আর তিন-
কড়ি স্থির নেত্রে সমুদ্রবন্ধের জাহাজের দিকে চেয়ে রইল।



চোদ্দ

আমি মনে করেছিলাম বস্বেতে সমুদ্রের জলে স্নানীলা-দিদিকে ভাসিয়ে দেবার পর আমার আর কিছু বলবার আবশ্যক হবেনা, স্নানীলা-দিদির জীবনের অবশিষ্ট কথা তাঁরাই কেউ বলবেন। কিন্তু ভগবান আমারই উপর শেষ কথা লিখবার ভার দিয়েছেন; স্মরণ্য অবশিষ্ট কথা আমাকেই বলতে হচ্ছে।

তবে, আমার একটা সুবিধা হয়েছে; আমি নিজে একটি কথাও বলব না, বলবার আবশ্যক হবে না। স্নানীলা-দিদি চ'লে যাবার পর এতদিনের মধ্যে ডাক্তারসাহেব আমাকে যে সকল পত্র লিখেছিলেন, স্নানীলা-দিদি রাণীকে যে সকল পত্র দিয়েছিলেন, সে সমস্তই আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। আর স্নানীলা-দিদি তিনকড়িকে কয়েকখানি চিঠি লিখেছিলেন, তিনকড়ি সেগুলিও আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সকল চিঠির কয়েকখানি প্রকাশ করলেই আমার কর্তব্য শেষ হ'বে। ডাক্তারসাহেব আমাকে ইংরাজী ভাষাতেই পত্র লিখেছিলেন, সেগুলির বাঙ্গলা অম্ববাদ আমিই করেছি। স্নানীলা-দিদির সব চিঠিই বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। এখন সেই চিঠিগুলিই আমি যথাযথ উদ্ধৃত করে আমার কঠোর কর্তব্য শেষ করি।

প্রথম পত্র

এডেন—সোমবার

প্রিয় হরেন্দ্রনাথ,

তোমাকে আর 'ডাক্তার মুখার্জি' বলে সম্বোধন করতে পারছি। তুমি পরলোকগত সতীশের জামাই ; সুতরাং আমারও জামাই। তোমাকে আমি আমার পুত্রের মতই মনে করি।

আমরা আজ এডেনে পৌঁছে গিয়েছি। আমার ভয় হয়েছিল, সমুদ্রে জাহাজের দোলাতে সুনীলা অসুস্থ হয়ে পড়বে। বারা কখন সমুদ্রে জাহাজে চড়ে নাই, তাহাদের প্রায় সকলেরই সমুদ্র-পীড়া (Sea sickness) হয়ে থাকে। সুনীলার সমুদ্র-পীড়া দূরে থাকুক, সামান্য একটু অসুস্থ বোধও সে এ কয়দিন করে নাই। তোমাদের ছেড়ে এসে আমার মন কাতর হয়েছে, কতবার তোমাদের কথা মনে হয়েছে। কিন্তু, কি আশ্চর্য, সুনীলার একটুও ভাবান্তর হয় নাই; সে যেন অধিকতর প্রসুন্ন হয়েছে, তার মনে যেন কোন চিন্তার উদয় হয় নাই, কারও কথা যে সে ভাবে, তার মুখ দেখে তা মোটেই মনে হয় না। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি অনেক নর-নারীর সংস্রবে এসেছি; ভারতবর্ষেও অনেককে দেখেছি; ইউরোপেও অনেককে দেখেছি; কিন্তু সুনীলার মত মেয়ে আমি কখনও দেখি নাই:—সে একেবারে সুখদুঃখের অতীত স্থানে চলে গিয়েছে; তোমরা যে ছয়টা রিপূর কথা বলে থাক, সুনীলা সে ছয়টাকেই বশীভূত করেছে। তারপর তোমাদের শাস্ত্রে যে বলে 'নীতাতপম্বন্দসহিষ্ণু' সুনীলা তাই

হ'য়েছে। স্মৃতরাং, বিগত দুই বৎসরে স্বামী অচলানন্দজি স্মৃশীলাকে একেবারে দেবী তৈরী করে দিয়েছেন ; তার হরিদ্বারের আশ্রমে বাস বিফল হয় নাই—সর্ব্বাংশে সফল হ'য়েছে।

আর একটা কথা বলি। এমন অসাধারণ মেধা আমি কোন স্ত্রী-পুরুষে দেখি নাই। মেয়েটা, যাকে তোমরা শ্রুতিধর বল, তাই। এই সামান্ত কয়টা দিনে সে ইংরাজী ভাষা এমন শিখে ফেলেছে যে, আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছি। যে কথাটা যেমন ক'রে বলেছি, ঠিক তেমনই ক'রে সে কথা সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। পড়াশুনার জন্তু তো এ কয়দিন সে বেশী সময় ব্যয় করে নাই। প্রাতঃকালে উঠে সেই যে ডেকে গিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে সমুদ্র আর আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সে যেন তন্দ্রায় হ'য়ে যায়। আমি তার এই ধ্যান ভঙ্গ করিনে। দশটার পর সে স্নান করে। তারপর আমার কাছে ব'সে ইংরাজী পড়ে। তার পড়ার সঙ্গে আমি দৌড়ে পেরে উঠিনে। চারটে বাজলেই সে পড়া ছেড়ে ওঠে ; তখন আর তাকে ক্যাবিনের মধ্যে আটকে রাখতে পারিনে—সমুদ্র আর আকাশ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে তখন অধীর আগ্রহে ডেকের দিকে ছুটে যায়। তারপর সেই অপার জলনিধি আর অসীম আকাশ তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে। এ মেয়েকে কি বলব হরেন্দ্র !

সারাদিন্তু সে কিছু খায় না—জলবিদ্যুৎ না। সন্ধ্যার পর ক্যাবিনের মধ্যে একবার এসে সামান্ত ফলটল খায় ; তারপরই

আবার ছুটে যায় সেই নক্ষত্র-খচিত আকাশ আর নীলাশুর কাছে ।

এ কয়দিন এই ভাবেই কেটেছে । সুশীলার জ্ঞান আমার যে ভয় ছিল, তা আর নেই । তাকে দেখলে মনে হয় তার যেন সংসারে কোন বন্ধন নেই । এর পরে তার ভাবের কি পরিবর্তন হয়, তা পরে জানাব ।

তোমাদের কুশল সংবাদ যেন সর্বদা পাই । পথের মধ্যে আর কোন স্থান থেকে পত্র লিখবার সুবিধা করতে পারব, তা ঠিক বলতে পারছি নে । তবে, এ কথা ঠিক জেনে রাখ যে, সুশীলা অসুস্থ হ'লে তখনই তোমাদের জানাব । ডাকের সময় হয়েছে ; আজ এইখানেই ইতি ।

তোমাদের চিরবন্ধু—গ্রেহাম

দ্বিতীয় পত্র

আমার স্নেহের রাগী,

‘জয় বাবা বিশ্বনাথজীকী জয়’—এতদিন পরে কা’ল ডাকায় নেমেছি । একেবারে খাঁটি বিলেত ।

আজ থেকে আর কাউকে পত্র লিখতে পারি নি । একেবারে সময় পাই নি । দিনরাত শুধু সমুদ্র আর আকাশ আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছিল । তারা কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় নি ! তাদের সঙ্গে গল্প করেই শেষ করতে পারিনি, তার পত্র লিখব কখন । সেই জন্তই আমি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ পাঠাইনি । সে অভাব ডাক্তারসাহেব বোল

আনা পূরণ করেছেন। যেখানে জাহাজ থেমেছে, সেইখানেই ঐ বৃদ্ধা মানুষ ছুটে নেমে গিয়েছেন তোমাদের কাছে তার পাঠাবার জন্ত। আমি কোন দিন কোথাও তীরে নাশিনি। ডেক চেয়ারখানির সঙ্গে আমি অতি মধুর সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম, তাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না।

দেখ রাণী, যে কয়দিন জাহাজে ছিলাম, সেই কয়দিনে ইংরাজী খুব পড়েছি, অর্থাৎ রোজ গড়ে এই ষটটা তিনেক। সেও কর্তব্যের খাতিরে, প্রাণের আগ্রহে নয়! ডাক্তারসাহেব শুধু চিকিৎসকই নন, জ্যোতিষীই নন, তিনি পাকা মাষ্টার মশাই। এই তো ক'টামাত্র দিন, এরই মধ্যে আমি যা হোক এক রকম ইংরাজী বলতে শিখেছি; অক্ষর-পরিচয় তো আগেই ছিল।

এইবার বিলেতের কথা বলি। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এক কথাতেই বিলেতের সব পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন—এই বিলেত দেশটা মাটির! এর পরে আর কথা নেই। সবে কা'ল এসেছি; এখনও ঘরের বা'র হইনি। দিনকয়েক শুয়ে ব'সে বিজ্ঞান করে নিই, তারপর বেড়ানো যাবে। তখন বিলেতের কথা বলব।

আমরা যে বাড়ীতে আছি, সেটা সহরের বাইরে। কোন গোলমাল নেই। ছোটখাটো বাড়ী, আর তার চারদিকে বাগান। বাড়ীখানি আমার বড়ই ভাল লেগেছে; কেন পটে আঁকা। এখানি ডাক্তার সাহেবের নিজের বাড়ী।

এই বাড়ীতে কা'ল বিকেলে এসে যখন উঠলাম তখন আমাদের অভ্যর্থনা করলেন কে, তা জান রাণী! তাঁর নাম মিস্

বারু—আমার শিক্ষয়িত্রী। তিনি কা'লই সকালবেলায় এসে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। অতি ভাল মানুষ, একেবারে বাঙ্গালী মেয়ে বললেই হয়। অনেকদিন বাঙ্গলা দেশে মেয়ে-মিশনে ছিলেন; আমাদের দেশের সব জানেন। তাঁকে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হ'য়েছে। তিনি আমাকে 'আজ ছুটি দিয়েছেন, কাল থেকে পড়া আরম্ভ করবেন। আজ তাই তোমাদের কাছে পত্র লিখবার সময় পেলাম। কা'ল থেকে শুধু পড়া, আর পড়া। আমি ঠিক করেছি, লেখাপড়া ছেড়ে টো-টো ক'রে বেড়াব না; তাতে পড়ার ক্ষতি হ'বে। বিলেত তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। বার জন্ত এসেছি, তা শেষ হ'য়ে গেলে, তখন শুধু বেড়াও, আর বেড়াও। স্মরণ্য, এর পর থেকে আর বড় পত্র লেখার উপকরণ কোথায় পাব। আমরা ভাল আছি; তোমরা কেমন আছ, আমার ভবশঙ্কর কেমন আছে—বাস্। এটুকু আমি প্রতি সপ্তাহেই লিখতে পারব। তুমি কিন্তু তাই ব'লে পোষ্ট কার্ডে চিঠি লিখো না—তোমার কাছ থেকে পোষ্ট কার্ড এলে, তা নেবই না; লিখে দেব Refused, 'রিফিউসড্' (কেরং) বুঝলে।

আজ আর বেশী লিখব না। কাকীমাকে আমার প্রণাম জানাইও; আমাইবাবুকে আমার সেলাম; তুমি আমার আশীর্বাদ নিও; আর শ্রীমান্ ভবশঙ্করকে আমার পক্ষ থেকে দশটা চুমু দিও, আর বোলো, তার মাসীমা মেমসাহেব হ'য়েছে।

আশীর্বাদিকা—সুশীলা চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় পত্র

তিনকড়ি মামা,

কা'ল বিলেতে পৌঁছেছি। পথে কোন কষ্টও হয় নি, অসুবিধাও হয় নি। শুনেছিলাম, জাহাজে সমুদ্র-পীড়া হয়; আমার কিছু হয় নি, একটু মাথাঘোরাও টের পাই নি। সমুদ্র আরু আকাশ যে এত সুন্দর, তা আমি জানতাম না।

কা'ল সবে এসেছি, বিলেতের কিছুই দেখি নি; তার আর কি খবর তোমাকে দেব। তুমিও তা শুনবার জন্ত ব্যস্ত হও নি।

এখানে আসা যে তোমার মত ছিল না, তা তুমি মুখ ফুটে না বললেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি আমাকে নির্বাসন দণ্ডই দিয়েছ। কিন্তু, আমাকে কি তুমি তোমার মন থেকে বা'র করে দিতে পেরেছ? কিছুতেই না, তিনকড়ি মামা, কিছুতেই না। আমি তোমার শনি হ'য়ে এসেছিলাম। তুমি যে তোমার এই পাগলী মেয়েকে কত ভালবাস, তা আমি জানি। তুমি আমাকে যে পথ দেখিয়েছিলে, সে পথ যে আমার নয়, তা তুমি বুঝেও বুঝতে চাও নি। দেখ মামা, আমি একটা কথা বলি। ষর-সংসার করা বিধাতা আমার অন্তরে লেখেন নাই, তোমার অন্তরেও না। কিন্তু, তুমি একটা ভুল করেছ। তুমি মনে করেছ, আমার এই সব দুর্গতি, এই সব কষ্ট-বন্ত্রণার কারণ তুমি। তাই তুমি আমার জন্ত অত কাতর হ'য়েছিলে; এখনও তোমার সে ভ্রম দূর হয় নি। আমি তোমাকে বলছি তিনকড়ি মামা, তোমার কোন অপরাধ নেই। আমি যা কিছু

করছি, তার জন্ত তুমি একটুও দায়ী নও। কবুলেটোলার আড্ডা আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে নাই। আমি ক্ষণেকের জন্ত আত্মবিশ্বস্ত হ'য়েছিলাম; কিন্তু, তা সামলে নিয়েছিলাম। এর মধ্যে তোমার অপরাধ কোথায়? কিন্তু, তুমি এতদিনেও তা বুঝলে না; যে অপরাধ তুমি কর নাই, সেই কল্পিত অপরাধের জন্ত তুমি কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছ। আগেই বলেছি, তোমাকে সংসারী হ'তে বল্ছিনে; সে পথ তোমার নয়; কিন্তু, তাই ব'লে তোমাকে সন্ন্যাসী হ'তেও বলব না। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি, তা সফল করবে তুমি—তুমি ডিনকড়ি মামা, একমাত্র তুমি। তোমার ত্যাগের কথা, তোমার অতুলনীয় নেহের কথা মনে করে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে এখানে কাজ করব। তার পর দেশে ফিরে যাওয়া যদি ভগবানের বিধান হয়, তা হ'লে সেখানেও তুমিই আমার দক্ষিণ হস্ত হ'বে। এই কথাটা কোনদিন তুমি ভুলো না। এই আমার অনুরোধ, এই আমার প্রার্থনা।

আমি যে সর্বদা তোমাদের কাছে চিঠি লিখতে পারব, তা আমার মনে হয় না। আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়বার জন্ত আমার প্রাণ মন সমর্পণ করব; অস্ত্র কোন চিন্তা, কারও কথা আমি এখন ভাবব না। আমার সংবাদ তোমরা ডাক্তারসাহেবের কাছ থেকেই পাবে।

মাসীমাকে আমার শতসহস্র প্রণাম দিও। তিনি যেন প্রতিদিন এই অভাগীকে আশীর্ব্বাদ করেন।

তোমার নেহের—সুশীলা

চতুর্থ পত্র

প্রিয় হরেন্দ্রনাথ,

সুশীলাকে এই সোমবারে লণ্ডনের ডাক্তারী কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। কলেজের অধ্যক্ষ ও ছই-চারজন অধ্যাপক তো বিশ্বাসই করতে চান না যে, এই সামান্য সাত মাসে সুশীলা এ-বি-সি থেকে আরম্ভ করে এত বেশী শিক্ষালাভ করেছে। তাঁরা বললেন, সাত মাস কেন, সাত বছরেও কেউ এত শিখতে পারে না। সুধু কি ইংরাজী ভাষা, এই সাত মাসে সুশীলা চিকিৎসা-শাস্ত্র-সংস্ক্বে অনেক বই পড়ে ফেলেছে, এ কথা তোমাকে পূর্বের চার পাঁচখানা পত্রেই জানিয়েছি। কি আশ্চর্য্য মেয়ে এই সুশীলা! কি অদ্ভুত তার মেধা! কি অবিচলিত তার অধ্যবসায়! বলতে গেলে, এই সাত মাসে সে অসাধ্য সাধন করেছে। এ সব কথা প্রতি পত্রেই তোমাকে, রাণীকে, তিনকড়িকে লিখেছি। তবুও বারবার সুশীলার পড়াশুনার অপূর্ব্ব-উন্নতি, তার জ্ঞানলাভের একাগ্রতার কথা বলতে ইচ্ছা করে; বারবার ব'লেও আমার তৃপ্তি বোধ হয় না।

দেখ হরেন্দ্রনাথ, আমি পূর্ব্বের উইল রদ করে নূতন উইল করেছি। তাতে আমার পেম্বনের টাকা আর আমার এই ছোট বাড়ীটা ব্যতীত আর যা কিছু আছে, সমস্ত সুশীলার নামে লিখে দিয়েছি। তার এখানকার পড়াশুনা শেষ হ'লে যখন সে বাঙ্গলা দেশে ফিরে যাবে, তখনও যদি আমি বেঁচে থাকি, তা হ'লে তার সঙ্গে আমিও তোমাদের দেশে যাব।

সেখানে গিয়ে স্মৃশীলা যা করতে বলবে, সেই রকম ব্যবস্থা ক'রে, জীবনান্ত পর্য্যন্ত তোমাদের দেশেই থাকব। স্মৃশীলার এখানকার কাজ শেষ হ'বার অব্যবহিত পূর্বেই তোমাকে সংবাদ দেব, তুমি তখন তোমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে; তুমি, রাণী ও ভবশঙ্করকে নিয়ে এখানে আসবে। তারপর সবাই এক সঙ্গে ভারতবর্ষে যাব+ -

আর একটা কথা। আমি তিনকড়িকেও কিছু টাকা দিবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা হোলো না। বোধ হয় স্মৃশীলা কোন রকমে আমার অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে তিনকড়িকে সে কথা জানিয়েছিল। তিনকড়ি প্রকারান্তরে সেই কথার উল্লেখ ক'রে আমাকে যে ভয় দেখিয়েছিল, তাতে তার সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করতে সাহসী হই নাই; সে ব্যবস্থা স্মৃশীলাই করবে ব'লে আমার স্থির ধারণা হ'য়েছে।

স্মৃশীলাকে কলেজে রেখে এসে আমি একেবারে অধীর হ'য়ে পড়েছি। এই স্মৃশীলা-শূন্য বাড়ীতে আমার কিছুতেই মন টিকছে না। যে দিকে চাই, সেই দিকেই স্মৃশীলার স্মৃতি-বিজড়িত। আমি ঠিক করেছি, প্রতিদিন অপরাহ্নে লগুনে গিয়ে তার সঙ্গে দুই-এক ঘণ্টা কাটিয়ে আসব, এমন মায়ার বন্ধনে এই বৃদ্ধকে সে ফেলেছে।

বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এখনই স্মৃশীলাকে দেখবার জন্য আমি লগুনে যাব। সেইজন্য এখানেই এই পত্র শেষ করলাম। পরের মেলে স্মৃশীলার কলেজ-জীবন সম্বন্ধে তোমাকে জানাব।

তোমরা আমার ভালবাসা গ্রহণ করিও । মাষ্টার ভবশঙ্করকে আমার শত-শত আশীর্বাদ । ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে যেন সর্বাংশে সতীশচন্দ্রের মত হয় । এর বেশী আশীর্বাদেদের কথা আমি জানি নে ।

তোমাদের
গ্রেহাম

এই সাত মাসে আমরা ডাক্তারসাহেব আশীর্বাদেদের কাছ থেকে বত পত্র পেয়েছি, তিনকড়িও যে সব পত্র পেয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, তার সকলগুলি দিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানি মহাভারত হয় । সে চেষ্টা না করে ডাক্তারসাহেবের শেষ টেলিগ্রামের অনুবাদ এবং তার পরবর্তী পত্রখানি দিয়েই অভাগী স্মৃতিলাদিদির জীবন-কথা শেষ করব । আমার পরম দুর্ভাগ্য যে, আমাকেই এ সব কথা লিখবার জন্য স্মৃতিলাদিদি আমাকে বাঁচিয়ে রেখে নিজের অনন্তধামে চলে গেলেন । শেষ সময়ে একবার তাঁর মুখখানি দেখতে পেলাম না । এখন মনে হচ্ছে রাগী ঠিক কথাই বলেছিল “এমনি মনে হচ্ছে আমার, গেলে দেখা আর হ’বে না ।”

তার সেই ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হ’য়ে গেল ; ডাক্তারসাহেবের গণনাই ফলে গেল ।

টেলিগ্রামের অনুবাদ

সব শেষ । আজ প্রাতঃকালে মেয়েদের হাসপাতালে ভিউটি-করবার সময় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ’য়ে

সুশীলা অনন্তধামে চলে গেছে। পত্রে সব কথা জানাচ্ছি।
তিনকড়িকে তোমরাই এ সংবাদ দিও, আমি পারব না।

প্রোহাম্

শেষ পত্র

হরেন্দ্রনাথ,

সকল আশা, সমস্ত বাসনা বাতাসে মিলিয়ে গেল। সুশীলা
ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

কা'লও বিকেলে আমি সুশীলাকে প্রতিদিনের মত দেখতে
গিয়েছিলাম। তার চেহারার কোন বৈলক্ষণ্য দেখতে পাই নি ;
অনু দিনের চাইতে কা'ল যেন তাকে বেশী প্রফুল্ল দেখেছিলাম।
আর আজ—কোথায় সুশীলা, কোথায় সে? হরেন্দ্রনাথ, আমি
যে কি ব্যথা পেয়েছি, তা প্রকাশ করতে পারছিনে।

আজ প্রাতঃকালে ন'টার সময় বাড়ীতে কি যেন করছিলাম,
এমন সময় একজন লোক তাড়াতাড়ি এসে আমাকে বলল যে,
আমাকে এখনই লগনের মেডিকেল কলেজে যেতে হ'বে ;
কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে ডেকেছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করে
কোন সন্ধানই পেলাম না।

কোন অশুভ কিছু ঘটেছে মনে করে আমি তখন যে অবস্থায়
ছিলাম, সেই অবস্থাতেই উর্দ্ধ্বাসে লগনের কলেজে গেলাম।
দেখি, একটা বারান্দায় একদল ছাত্র-ছাত্রী ও শুশ্রূষাকারিণী
বিষন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে আস্তে দেখেই একটা
ছাত্রী আমাকে পাশের একটা ঘরে প্রবেশ করতে বলল। আমি

সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি কলেজের অধ্যক্ষ ও অনেকগুলি অধ্যাপক বসে আছেন। আমাকে দেখেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। অধ্যক্ষ মহাশয় অগ্রসর হ'য়ে আমার হাত ধরে বললেন, ডাক্তার গ্রেহাম, একটা শোচনীয় সংবাদ শুনবার জন্ত প্রস্তুত হোন। আপনার স্ত্রীলা পরলোকগতা!

এই কথা শুনে আমার মাথা একেবারে ঘুরে গেল; আমি মাটিতে পড়ে যাবার মত হ'তেই অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে ধরে একখানি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

একটু পরেই আমি সামলে নিতেই অধ্যক্ষ মহাশয় বললেন, একটা ওয়ার্ডে একটা রোগিনীর বিছানায় স্ত্রীলা গিয়ে বসেছিল। তাকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার পরই হঠাৎ বাঙ্গলা ভাষায় 'মা গো' বলে চীৎকার করেই অজ্ঞান হ'য়ে সেই রোগিনীর বিছানায় পড়ে গেল। তখনই সংবাদ পেয়ে সকলে ছুটে এলেন, আমিও সেখানে গেলাম। আমাদের চিকিৎসী-বিজ্ঞানে যা কিছু করতে বলে, তার কোনই ক্রটি আমরা করি নি। কিন্তু আমার বন্ধু, কি বলব, কিছুতেই তার জ্ঞান ফিরল না। অভাগী স্ত্রীলা! এত সামান্য দুই মাসের মধ্যেই এখানকার সকলের হৃদয় এই অসাধারণ বাঙ্গালী মেয়েটা দখল করে বসেছিল। এত শীঘ্র সব শেষ হ'বে বলেই বৃষ্টি প্রভু তাকে এত গুণের আধার করেছিলেন। অভাগী স্ত্রীলা! ডাক্তার গ্রেহাম, আমরা এমন শিক্ষার্থিনী কখনও পাই নাই, ভবিষ্যতে পাব ব'লেও মনে হয় না।

একজম অধ্যাপক তখন আমার হাত ধরে পাশের একটা

ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখি, একখানি খাটিয়ার উপর শুভ্র শয্যায় আমার স্নানীলা অন্তিম-শয্যায় শায়িতা। তার সর্বশরীর ফুল দ্বারা আচ্ছাদিত। মুখে তার সেই হাসি তখনও লোকে আছে! .

আমি একবার সেই অনিন্দ্যসুন্দর, পবিত্রতা মাখা মুখের দিকে চেয়ে দৌড়ে সে ঘর থেকে বে'র হ'য়ে এলাম। সেই দৃশ্যের সম্মুখে আমি থাকতে পারলাম না।

তারপর আমারই অভিপ্রায় মত স্নানীলার শবদেহ দাহ করবার ব্যবস্থা হোলো। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, গুরুশ্রমিককারিণী প্রায় সকলেই শবের অন্তিমগমন করলেন। শবদাহের-আগারে উপস্থিত হ'লে একজন ধর্মযাজক পরলোকগতা স্নানীলার জন্ম করুণ-স্মরে প্রার্থনা করলেন। তারপর সেই আগারের মধ্যে মৃতদেহ অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমরা বাইরে ব'সে রইলাম। ঘণ্টা দেড়েকেরই সব শেষ—হরেক্রনাথ, সব শেষ হ'য়ে গেল। আমাদের স্নানীলার মরদেহের চিহ্নমাত্রও রইল না।

প্রিয় হরেক্রনাথ, এরই জন্ম কি তোমাদের মেহের কোল থেকে স্নানীলাকে আমি টেনে এনেছিলাম। কানপুরে তোমাকে বলে-ছিলাম, স্নানীলার একটা গ্রহ বিশেষ অপ্রসন্ন, কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ না হ'তেই যে এমন হ'বে, তা আমি কোনদিন ভাবি নি। আমার আশা ছিল, এ গ্রহের দোষ খণ্ডন হ'বে। সে ভরসা তোমাদেরও দিয়েছিলাম। কিন্তু হায়! সব বৃথা হোলো। আমার একটা বাসনাও পূর্ণ হোলো না। বিধাতার অমোঘ বিধান হরেক্রনাথ, আর কি বলব।

এই একটু আগেই সব কাজ শেষ ক'রে ঘরে ফিরে এসেই তোমাকে পত্র লিখতে বসেছি; কলেজ থেকেই তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।

পুণে আসতে আসতেই আমার ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী আমি স্থির ক'রে ফেলেছি।

আমি আর এ-দেশে থাকব না হরেক্ষনাথ! আমি এখানে থাকতে পারব না। তোমাদের কাছেও আমি যাব না। তোমাদের কাছে গিয়ে কি বলব! আমি কয়েক দিনের মধ্যেই এখানকার বাড়ী বেচে, অন্যান্য ব্যবস্থা করে অবশিষ্ট জীবন অস্ট্রেলিয়ায় কাটা'ব স্থির করেছি। আমারও জীবন-কাল সংক্ষেপ হ'য়ে এসেছে।

আর একটা কাজ দুই এক দিনের মধ্যেই করব। আমাকে আবার নূতন একখানি উইল করতে হ'বে। তাতে আমার যা কিছু আছে, সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ স্ত্রীকড়িকে, আর এক ভাগ তোমার ছেলে ভবশঙ্করকে দিয়ে যাব। আমার যা পেন্সন আছে, তাতেই আমার দিন কেটে যাবে। এই পত্র যখন তোমাদের হাতে পৌঁছবে, তার আগেই উইল রেজেষ্টরী হ'য়ে যাবে, আমিও অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করব; সুতরাং তোমরা আমার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করবার সময়ই পাবে না।

আর একটা কথা বলি। যদি পার, তা হ'লে স্ত্রীলগ্নার স্মৃতি-রক্ষার জন্ত কিছু করো। কি করবে, তা আমি জানিনে, বলতেও পারব না।

অভাগী

১২২.

যেখানেই থাকি, তোমাদের কথা ভুলব না, তোমরা যে আমার
সুশীলার বড় মেহের পাত্র ছিলে।

বিদায় হরেক্রনাথ, বিদায় রাণীমা !

তোমাদের হৃৎভাগ্য
গ্রেহাম

শেষ



